৪- সূরা আন-নিসা

سُورَةُ النِّسَاءِ

সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

আয়াত সংখ্যাঃ ১৭৬ ।

নাযিল হওয়ার স্থানঃ সূরাটি সর্বসম্মত মতে মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে ।

সূরাটির ফযিলতঃ সূরার ফযিলত সম্পর্কে এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে কেউ প্রথম সাতটি সূরা গ্রহণ করবে সে আলেম হিসেবে গণ্য হবে” । [মুসনাদে আহমাদঃ ৬/৮৫, ৬/৯৬] তাছাড়া আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “যে সূরা আলে ইমরান পড়বে সে অমুখাপেক্ষী হবে, আর সূরা আন-নিসা হচ্ছে সৌন্দর্যপূর্ণ ।” [সুনান দারেমীঃ ৩৩৯৫]

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

১. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর(১) যিনি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ

---

(১) সূরার শুরুতে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অন্যের অধিকার সংক্রান্ত বিধান জারি করা হয়েছে । যেমন- অনাথ ইয়াতীমের অধিকার, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও স্ত্রীদের অধিকার প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে । উল্লেখ্য যে, হক্কুল-‘ইবাদ বা অন্যের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কতকগুলো অধিকার রয়েছে, যেগুলো সাধারণতঃ দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় পড়ে এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তা কার্যকর করা যেতে পারে । সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ও শ্রমের মজুরী প্রভৃতি এ জাতীয় অধিকার যা মূলতঃ দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে কার্যকর হয়ে থাকে । এসব অধিকার যদি কোন এক পক্ষ আদায় করতে ব্যর্থ হয় অথবা সেক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, তাহলে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তার সুরাহা করা যেতে পারে । কিন্তু সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, কারো নিজ বংশের ইয়াতীম ছেলে-মেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজনের পারস্পারিক অধিকার আদায় হওয়া নির্ভর করে সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার উপর । এসব অধিকার তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না । কোন চুক্তির মাধ্যমেও তা নির্ধারণ করা দুষ্কর । সুতরাং এসব অধিকার আদায়ের জন্য আল্লাহ্-ভীতি এবং আখেরাতের ভয় ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন উত্তম উপায় নেই । আর একেই বলা হয়েছে ‘তাকওয়া’ । বস্তুতঃ এই তাকওয়া দেশের প্রচলিত আইন ও প্রশাসনিক শক্তির চেয়ে অনেক বড় । তাই আলোচ্য সূরাটিও তাকওয়ার বিধান দিয়ে শুরু হয়েছে । সম্ভবতঃ এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের খোত্‌বায় এ আয়াতটি পাঠ করতেন । বিয়ের খোতবায় এ আয়াতটি পাঠ করা সুন্নাত । তাকওয়ার হুকুমের সাথে সাথে আল্লাহ্‌র অসংখ্য নামের মধ্যে এখানে ‘রব’ শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যেও একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে । অর্থাৎ এমন এক সত্তার

مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ
مِنۡهُمَا رِجَالًا كَثِيۡرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
الَّذِىۡ تَسَآءَلُوۡنَ بِهٖ وَالۡاَرۡحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيۡبًا ①

তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন(১) এবং তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক্ দাবী কর(২) এবং তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও(৩)। নিশ্চয় আল্লাহ্

বিরুদ্ধাচারণ করা কি করে সম্ভব হতে পারে, যিনি সমগ্র সৃষ্টিলোকের লালন-পালনের যিম্মাদার এবং যাঁর রুবুবিয়্যাত বা পালন-নীতির দৃষ্টান্ত সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে স্তরে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত।

(১) এখানে দু'টি মত রয়েছে, (এক) তার থেকে অর্থাৎ তারই সমপর্যায়ের করে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। (দুই) তার শরীর থেকেই তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। এ মতের সপক্ষে হাদীসের কিছু উক্তি পাওয়া যায়, যাতে বুঝা যায় যে, মহিলাদেরকে বাঁকা হাঁড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। [দেখুন- বুখারীঃ ৩৩৩১, মুসলিমঃ ১৪৬৮]

(২) বলা হয়েছে যে, যাঁর নাম উচ্চারণ করে তোমরা অন্যের থেকে অধিকার দাবী কর এবং যাঁর নামে শপথ করে অন্যের কাছ থেকে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে থাক সে মহান সত্ত্বার তাকওয়া অবলম্বন কর। আরও বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্কে - তা পিতার দিক থেকেই হোক, অথবা মায়ের দিক থেকেই হোক - তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাক এবং তা আদায়ের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন কর।

(৩) আলোচ্য আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। সুতরাং তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখ। এ অর্থটি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে। [তাবারী] আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমরা যে আল্লাহ্ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের খাতিরে পরস্পর কোন কিছু চেয়ে থাক। অর্থাৎ তোমরা সাধারণত বলে থাক যে, আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের খাতিরে কোন কিছু তোমার কাছে চাই। সুতরাং দু' কারণেই তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। এ অর্থটি মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] পবিত্র কুরআনের আত্মীয়তার সম্পর্ক বুঝানোর জন্য 'আরহাম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা মূলতঃ একটি বহুবচনবোধক শব্দ। এর একবচন হচ্ছে 'রাহেম'। যার অর্থ জরায়ু বা গর্ভাশয়। অর্থাৎ জন্মের প্রাক্কালে মায়ের উদরে যে স্থানে সন্তান অবস্থান করে। জন্মসূত্রেই মূলতঃ মানুষ পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বুনিয়াদকে ইসলামী পরিভাষায় 'সেলায়ে-রাহ্‌মী' বলা

তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক(১) ।

২. আর ইয়াতীমদেরকে তোমরা তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করো(২) এবং

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ

হয় । আর এতে কোন রকম বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হলে তাকে বলা হয় 'কেত্ব'য়ে-রাহ্মী' । হাদীসে আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার রিযিকের প্রাচুর্য এবং দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশা করে, তার উচিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা । [বুখারীঃ ২০৬৭; মুসলিমঃ ২৫৫৭] অন্য হাদীসে 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ 'রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের প্রায় সাথে সাথেই আমিও তাঁর দরবারে গিয়ে হাজির হলাম । সর্বপ্রথম আমার কানে তাঁর যে কথাটি প্রবেশ করল, তা'হল এইঃ হে লোক সকল! তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বেশী বেশী সালাম দাও । আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষকে খাদ্য দান কর । আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোল এবং রাতের বেলায় সালাতে মনোনিবেশ কর, যখন সাধারণ লোকেরা নিদ্রামগ্ন থাকে । স্মরণ রেখো, এ কথাগুলো পালন করলে তোমরা পরম সুখ ও শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে' । [মুসনাদে আহমাদ: ৫৪৫১; ইবন মাজাহ্: ৩২৫১] অন্য হাদীসে এসেছে, 'উম্মুল-মুমিনীন মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর এক বাঁদিকে মুক্ত করে দিলেন । অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন এ খবর পৌঁছালেন, তখন তিনি বললেন, তুমি যদি বাঁদিটি তোমার মামাকে দিয়ে দিতে, তাহলে অধিক পূণ্য লাভ করতে পারতে' । [বুখারীঃ ২৫৯৪] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেনঃ 'কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করলে সদকার সওয়াব পাওয়া যায় । কিন্তু কোন নিকট আত্মীয়কে সাহায্য করলে একই সঙ্গে সদ্কা এবং আত্মীয়তার হক আদায়ের দ্বৈত পূণ্য লাভ করা যায়' । [বুখারীঃ ১৪৬৬, মুসলিমঃ ১০০০]

(১) এখানে মানুষের অন্তরকে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায়ের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ বলেন, 'আল্লাহ্ তোমাদের ব্যাপারে খুবই সচেতন ও পর্যবেক্ষণকারী ।' আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরের ইচ্ছার কথাও ভালভাবে অবগত রয়েছেন । কিন্তু যদি লোক লজ্জার ভয়ে অথবা সমাজ ও পরিবেশের চাপে পড়ে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সুব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্র কাছে এর কোন মূল্য নেই ।

(২) আয়াতে বলা হয়েছে, ইয়াতীমের সম্পদ তাদেরকে যথার্থভাবে বুঝিয়ে দাও । আরবী 'ইয়াতীম' শব্দটির অর্থ হচ্ছে- নিঃসঙ্গ । একটি ঝিনুকের মধ্যে যদি একটিমাত্র মুক্তা জন্ম নেয়, তখন একে 'দুররাতুন-ইয়াতীমাতুন' বা 'নিঃসঙ্গ মুক্তা' বলা হয়ে থাকে । ইসলামী পরিভাষায় যে শিশু-সন্তানের পিতা ইন্তেকাল করে, তাকে ইয়াতীম বলা হয় । ছেলে-মেয়ে বালেগ হয়ে গেলে তাদেরকে ইসলামী পরিভাষায় ইয়াতীম বলা হয় না । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ②

ভালোর সাথে মন্দ বদল করো না(১)। আর তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশিয়ে গ্রাস করো না; নিশ্চয় এটা মহাপাপ(২)।

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَٰمَىٰ

৩. আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি(৩) সুবিচার

'বালেগ হওয়ার পর আর কেউ ইয়াতীম থাকে না।' [আবু দাউদঃ ২৮৭৩] ইয়াতীম যদি পারিতোষিক অথবা উপঢৌকন হিসেবে কিছু সম্পদপ্রাপ্ত হয়, তাহলে ইয়াতীমের অভিভাবকের দায়িত্ব হচ্ছে সেসব মালেরও হেফাজত করা। ইয়াতীমের মৃত পিতা অথবা দেশের সরকার যে-ই উক্ত অভিভাবককে মনোনীত করুক না কেন; তার উপরই ইয়াতীমের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বর্তায়। উক্ত অভিভাবকের উচিত, ইয়াতীমের যাবতীয় প্রয়োজন তার গচ্ছিত ধন-সম্পদ থেকে নির্বাহ করা। এ আয়াতে ইয়াতিমের সম্পদ তার হাতে বুঝিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোন শর্তারোপ করা হয়নি। পক্ষান্তরে পরবর্তী ৬ নং আয়াতে এ সম্পদ তাদের কাছে প্রত্যার্পণ করার জন্য দু'টি শর্ত দিয়েছে। এক. ইয়াতীম বালেগ হতে হবে, দুই. ভাল-মন্দ বিবেচনা করার ক্ষমতা থাকতে হবে। কারণ, বালেগ হওয়ার পূর্বে তার জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পত্তি সংরক্ষণের মত না হওয়াই স্বাভাবিক। দুটো বিষয় তাদের মধ্যে পাওয়া গেলে তাদের সম্পদ তাদের কাছে ফেরৎ দেয়া উচিত। [আদওয়াউল বায়ান]

(১) মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ তোমরা হালালকে হারামের সাথে মিশিয়ে ফেলো না। [তাবারী]

(২) এ আয়াতে ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করাকে বড় গুনাহ্ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু গোনাহের পরিণাম সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হয়নি। এ সূরারই ১০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সেটা ঘোষণা করে বলেছেন, "যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তো তাদের পেটে আগুনই খাচ্ছে; তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।" [আদওয়াউল বায়ান]

(৩) এ আয়াতে ইয়াতীম মেয়েদের বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাধারণ আইন-কানুনের মত তা শুধু প্রশাসনের উপর ন্যস্ত করার পরিবর্তে জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহ্-ভীতির অনুভূতি জাগ্রত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যদি ইনসাফ করতে পারবে না বলে মনে কর, তাহলে ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিয়ে করবে না; বরং সে ক্ষেত্রে অন্য মেয়েদেরকেই বিয়ে করে নেবে। এ কথা বলার সাথে সাথে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে ইয়াতীম ছেলে-মেয়েদের কোন প্রকার অধিকার ক্ষুণ্ন না হয় সে ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ
مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا

করতে পারবে না(১), তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন বা চার(২); আর যদি

---

(১) জাহেলিয়াত যুগে ইয়াতীম মেয়েদের অধিকার চরমভাবে ক্ষুণ্ন করা হত। যদি কোন অভিভাবকের অধিনে কোন ইয়াতীম মেয়ে থাকত আর তারা যদি সুন্দরী হত এবং তাদের কিছু সম্পদ-সম্পত্তিও থাকত, তাহলে তাদের অভিভাবকরা নামমাত্র মাহ্‌র দিয়ে তাদেরকে বিয়ে করে নিত অথবা তাদের সন্তানদের সাথে বিয়ে দিয়ে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার চক্রান্ত করত। এসব অসহায় মেয়েদের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থার কথা তারা চিন্তাও করত না। আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ঠিক এ ধরণের একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। 'জনৈক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একটি ইয়াতীম মেয়ে ছিল। সে ব্যক্তির একটি বাগান ছিল, যার মধ্যে উক্ত ইয়াতীম বালিকাটিরও অংশ ছিল। সে ব্যক্তি উক্ত মেয়েটিকে বিয়ে করে নিল এবং নিজের পক্ষ থেকে 'দেন-মাহ্‌র' আদায় তো করলই না, বরং বাগানে মেয়েটির যে অংশ ছিল তাও সে আত্মসাৎ করে নিল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়'। [বুখারীঃ ৪৫৭৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তখনকার দিনে কারও কাছে কোন ইয়াতীম থাকলে এবং তার সম্পদ ও সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করলে সে তাকে বিয়ে করতে চাইত। তবে তাকে অন্যদের সমান মাহ্‌র দিতে চাইত না। তাই তাদের মাহ্‌র পূর্ণ ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের না দিয়ে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে কোন প্রকার ত্রুটি করার ইচ্ছা থাকলে তাদের বাদ দিয়ে অন্যান্য মহিলাদের বিয়ে করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [বুখারীঃ ৪৫৭৪] তবে এর অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য নারীদের বেলায় ইনসাফ বিধান করা লাগবে না। বরং অন্যান্য নারীদের বেলায়ও তা করতে হবে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) বহু-বিবাহ প্রথাটি ইসলামপূর্ব যুগেও দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্মমতেই বৈধ বলে বিবেচিত হত। আরব, ভারতীয় উপমহাদেশ, ইরান, মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশেই এই প্রথার প্রচলন ছিল। বহু-বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্তমান যুগেও স্বীকৃত। বর্তমান যুগে ইউরোপের এক শ্রেণীর চিন্তাবিদ বহু-বিবাহ রহিত করার জন্য তাদের অনুসারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে আসছেন বটে, কিন্তু তাতে কোন সুফল হয়নি। বরং তাতে সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফল রক্ষিতার রূপে প্রকাশ পেয়েছে। অবশেষে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক ব্যবস্থারই বিজয় হয়েছে। তাই আজকে ইউরোপের দূরদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বহু-বিবাহ পুনঃপ্রচলন করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করছেন। ইসলাম একই সময়ে চারের অধিক স্ত্রী রাখাকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইসলাম এ ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের জন্য বিশেষ তাকিদ দিয়েছে এবং ইনসাফের পরিবর্তে যুলুম করা হলে তার জন্য শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে। আলোচ্য আয়াতে একাধিক অর্থাৎ চারজন স্ত্রী গ্রহণ করার সুযোগ অবশ্য দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে এই চার পর্যন্ত কথাটি

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذٰلِكَ أَدْنَىٰٓ

আশংকা কর যে সুবিচার করতে পারবে না(১) তবে একজনকেই বা তোমাদের

আরোপ করে তার ঊর্ধ্ব সংখ্যক কোন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে না বরং তা হবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ- তাও ব্যক্ত করে দিয়েছে। ইসলাম পূর্ব যুগে কারও কারও দশটি পর্যন্ত স্ত্রী থাকত। ইসলাম এটাকে চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। কায়েস ইবন হারেস বলেন, 'আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন আমার স্ত্রী সংখ্যা ছিল আট। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসলে তিনি আমাকে বললেন, 'এর মধ্য থেকে চারটি গ্রহণ করে নাও'। [ইবন মাজাহঃ ১৯৫২, ১৯৫৩]

(১) পবিত্র কুরআনে চারজন স্ত্রীর কথা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সাথে সাথে এও বলে দেয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা তাদের মধ্যে সমতা বিধান তথা ন্যায় বিচার করতে না পার, তাহলে এক স্ত্রীর উপরই নির্ভর কর। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, একাধিক বিয়ে ঠিক তখনই বৈধ হতে পারে, যখন শরী'আত মোতাবেক সবার সাথে সমান আচরণ করা হবে; তাদের সবার অধিকার সমভাবে সংরক্ষণ করা হবে। এ ব্যাপারে অপারগ হলে এক স্ত্রীর উপরই নির্ভর করতে হবে এবং এটাই ইসলামের নির্দেশ। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক স্ত্রীর বেলায় সবার সাথে পরিপূর্ণ সমতার ব্যবহার করার ব্যাপারে বিশেষ তাকিদ দিয়েছেন এবং যারা এর খেলাফ করবে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তির খবর দিয়েছেন। নিজের ব্যবহারিক জীবনেও তিনি এ ব্যাপারে সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করে দেখিয়েছেন। এমনকি তিনি এমন বিষয়েও সমতাপূর্ণ আদর্শ স্থাপন করেছেন যে ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন ছিল না। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী রয়েছে, সে যদি এদের মধ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা ও ইনসাফ করতে না পারে, তবে কিয়ামতের ময়দানে সে এমনভাবে উঠবে যে, তার শরীরের এক পার্শ্ব অবশ হয়ে থাকবে'। [আবু দাউদঃ ২১৩৩, তিরমিযীঃ ১১৪১, ইবন মাজাহ্ঃ ১৯৬৯, আহ্মাদঃ ২/৪৭১]

এ সূরার ১২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, কোন এক স্ত্রীর প্রতি যদি তোমার আন্তরিক আকর্ষণ বেশী হয়ে যায়, তবে সেটা তোমার সাধ্যায়ত্ব ব্যাপার নয় বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও অন্যজনের প্রতি পরিপূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করা জায়েয হবে না। সূরা আন-নিসার এ আয়াতে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে না পারার আশংকার ক্ষেত্রে এক বিয়েতেই তৃপ্ত থাকার নির্দেশ এবং পরবর্তী আয়াতে "তোমরা কোন অবস্থাতেই একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না" এ দু'আয়াতের মধ্যে সমন্বয় হচ্ছে, এখানে মানুষের সাধ্যায়ত্ব ব্যাপারে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াতে যা মানুষের সাধ্যের বাইরে অর্থাৎ আন্তরিক আকর্ষণের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করা হয়েছে। সুতরাং দু'টি আয়াতের মর্মে যেমন কোন বৈপরীত্ব নেই, তেমনি এ আয়াতের দ্বারা একাধিক বিবাহের অবৈধতাও প্রমাণিত হয় না। যদি আমরা এ

অধিকারভুক্ত দাসীকেই গ্রহণ কর। এতে পক্ষপাতিত্ব(১) না করার সম্ভাবনা বেশী।

اَلَّا تَعُوْلُوْا ٣

৪. আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মাহ্‌র(২) মনের সন্তোষের সাথে(৩)

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۭ فَاِنْ طِبْنَ

আয়াতের শানে-নুযূলের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলছেন, একটি ইয়াতীম মেয়ে এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ছিল। লোকটি সে ইয়াতীম মেয়েটির সাথে সম্পদে অংশীদারও ছিল। সে তাকে তার সৌন্দর্য ও সম্পদের জন্য ভালবাসত। কিন্তু সে তাকে ইনসাফপূর্ণ মাহ্‌র দিতে রাযী হচ্ছিল না। তখন আল্লাহ্‌ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করে মাহ্‌র দানের ক্ষেত্রে ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা কায়েম করার নির্দেশ দেন। ইয়াতীম হলেই তার মাহ্‌র কম হয়ে যাবে, এমনটি যেন না হয় সেদিকে গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দান করা হয়। [বুখারীঃ ২৪৯৪, ৪৫৭৪, ৫০৯২, মুসলিমঃ ৩০১৮]

(১) এতে দু’টি শব্দ রয়েছে। একটি أَدْنٰى এটি دُنُوٌّ ধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ হয় নিকটতর। দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছেঃ ﴿اَلَّا تَعُوْلُوْا ﴾ যা عال শব্দ হতে উৎপন্ন, অর্থ ঝুঁকে পড়া। এখানে শব্দটি অসংগতভাবে ঝুঁকে পড়া এবং দাম্পত্য জীবনে নির্যাতনের পথ অবলম্বন করা অর্থে ব্যবহৃত করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, এ আয়াতে তোমাদের যা বলা হল যে, সমতা বজায় রাখতে না পারার আশংকা থাকলে এক স্ত্রী নিয়েই সংসারযাত্রা নির্বাহ কর কিংবা শরী‘আতসম্মত ক্রীতদাসী নিয়ে সংসার কর; -এটা এমন এক পথ যা অবলম্বন করলে তোমরা যুলুম থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘনের সম্ভাবনাও দূর হবে। تَعُوْلُوْا শব্দের দ্বিতীয় আরেকটি অর্থ হতে পারে মিসকীন হয়ে যাওয়া। এর সপক্ষে সূরা আত-তাওবার ২৮ নং আয়াতে ﴿عَيْلَةً﴾ শব্দটি এসেছে। সেখানে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে দারিদ্রতা। ইমাম শাফে‘য়ী বলেন, এর অর্থ, যাতে তোমাদের পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি না পায়। [ফাতহুল কাদীর]

(২) ইসলামপূর্ব যুগে স্ত্রীর প্রাপ্য মাহ্‌র তার হাতে পৌঁছতো না; মেয়ের অভিভাবকগণই তা আদায় করে আত্মসাৎ করত। যা ছিল নিতান্তই একটা নির্যাতনমূলক রেওয়াজ। এ প্রথা উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে কুরআন নির্দেশ দিয়েছেঃ ﴿وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ﴾ এতে স্বামীর প্রতি নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, স্ত্রীর মাহ্‌র তাকেই পরিশোধ কর; অন্যকে নয়। অন্যদিকে অভিভাবকগণকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মাহ্‌র আদায় হলে যার প্রাপ্য তার হাতেই যেন অর্পণ করে। তাদের অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ যেন তা খরচ না করে।

(৩) স্ত্রীর মাহ্‌র পরিশোধ করার ক্ষেত্রে নানা রকম তিক্ততার সৃষ্টি হত। প্রথমতঃ মাহ্‌র পরিশোধ করতে হলে মনে করা হত যেন জরিমানার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। এ অনাচার রোধ করার লক্ষ্কেই ﴿نِحْلَةً ۭ﴾ শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত হৃষ্টমনে তা পরিশোধ

لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ④

প্রদান কর; অতঃপর সন্তুষ্ট চিত্তে তারা মাহ্‌রের কিছু অংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে(১) ভোগ কর।

করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, অভিধানে ﴿نِحْلَةً﴾ বলা হয় সে দানকে, যা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে প্রদান করা হয়। মোটকথা, আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, স্ত্রীদের মাহ্‌র অবশ্য পরিশোধ্য একটা ঋণ বিশেষ। এটা পরিশোধ করা অত্যন্ত জরুরী। পরন্তু অন্যান্য ওয়াজিব ঋণ যেমন সন্তুষ্ট চিত্তে পরিশোধ করা হয়, স্ত্রীর মাহ্‌রের ঋণও তেমনি হৃষ্টচিত্তে, উদার মনে পরিশোধ করা কর্তব্য। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আব্দুর রহমান ইবন আউফ কোন এক মহিলাকে এক 'নাওয়া' (পাঁচ দিরহাম পরিমাণ) মাহ্‌র দিয়ে বিয়ে করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে খুশী দেখতে পেয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এক মহিলাকে এক নাওয়া পরিমাণ মাহ্‌র দিয়ে বিয়ে করেছি। [বুখারী: ৫১৪৮]

(১) অনেক স্বামীই তার বিবাহিত স্ত্রীকে অসহায় মনে করে নানাভাবে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে মাহ্‌র মাফ করিয়ে নিত। এভাবে মাফ করিয়ে নিলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মাফ হয় না। অথচ স্বামী মনে করত যে, মৌখিকভাবে যখন স্বীকার করিয়ে নেয়া গেছে, সুতরাং মাহ্‌রের ঋণ মাফ হয়ে গেছে। এ ধরণের যুলুম প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, "যদি স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মাহ্‌রের কোন অংশ ক্ষমা করে দেয়, তবেই তোমরা তা হৃষ্টমনে ভোগ করতে পার।" অর্থ হচ্ছে, চাপ প্রয়োগ কিংবা কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি করে ক্ষমা করিয়ে নেয়ার অর্থ কোন অবস্থাতেই ক্ষমা নয়। তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায়, খুশী মনে মাহ্‌রের অংশবিশেষ মাফ করে দেয় কিংবা পুরোপুরিভাবে বুঝে নিয়ে কোন অংশ তোমাদের ফিরিয়ে দেয়, তবেই কেবল তোমাদের পক্ষে তা ভোগ করা জায়েয হবে। এ ধরণের বহু নির্যাতনমূলক পন্থা জাহেলিয়াত যুগে প্রচলিত ছিল। কুরআন এসব যুলুমের উচ্ছেদ করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজো মুসলিম সমাজে মাহ্‌র সম্পর্কিত এ ধরণের নানা নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা প্রচলিত দেখা যায়। কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী এরূপ নির্যাতনমূলক পথ পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য। আয়াতে 'হৃষ্টচিত্তে' প্রদানের শর্ত আরোপ করার পেছনে গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। কেননা, মাহ্‌র স্ত্রীর অধিকার এবং তার নিজস্ব সম্পদ। হৃষ্টচিত্তে যদি সে তা কাউকে না দেয় বা দাবী ত্যাগ না করে, তবে স্বামী বা অভিভাবকের পক্ষে সে সম্পদ কোন অবস্থাতেই হালাল হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে শরী'য়তের মূলনীতিরূপে এরশাদ করেছেনঃ 'কারো পক্ষে অন্যের সম্পদ তার আন্তরিক তুষ্টি ব্যতীত গ্রহণ করা হালাল হবে না'। [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/৪২৩] এ হাদীসটি এমন একটা মূলনীতির নির্দেশ দেয়, যা সর্বপ্রকার প্রাপ্য ও লেন-দেনের ব্যাপারে হালাল এবং হারামের সীমারেখা নির্দেশ করে।

৫. আর তোমরা অল্প বুদ্ধিমানদেরকে তাদের ধন-সম্পদ অর্পণ করো না(১); যা দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের জীবন চালানোর ব্যবস্থা করেছেন এবং তা থেকে তাদের আহার-বিহার ও ভরণ-পোষনের ব্যবস্থা কর। আর তোমরা তাদের সাথে সদালাপ কর।

وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٥

৬. আর ইয়াতিমদেরকে যাচাই করবে(২)

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ

---

(১) এ আয়াতে ধন-সম্পদের গুরুত্ব এবং মানুষের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সম্পদের হেফাযতের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ ক্রটির সংশোধন নির্দেশ করা হয়েছে। তা হচ্ছে, অনেকেই স্নেহান্ধ হয়ে অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ ছেলে-মেয়ে অথবা স্ত্রীলোকদের হাতে ধন-সম্পদের দায়-দায়িত্ব তুলে দেয়। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পদের অপচয় এবং যা দারিদ্র ঘনিয়ে আসার আকারে দেখা দেয়। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন যে, কুরআনুল কারীমের এ আয়াতে নির্দেশ করা হচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি কিংবা অনভিজ্ঞ স্ত্রীলোকদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকো না, বরং আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু তোমাকে অভিভাবক এবং দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছেন, সেজন্য তুমি সম্পদ তোমার নিজের হাতে রেখে তাদের খাওয়া-পরার দায়-দায়িত্ব পালন করতে থাক। যদি তারা অর্থ-সম্পদের দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে নেয়ার আব্দার করে, তবে তাদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে দাও যে, এসব তোমাদের জন্যই সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যাতে তাদের মনোকষ্টের কারণ না হয়, আবার সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা না দেয়। [তাবারী] উপরোক্ত ব্যাখ্যা মতে, এমন সবার হাতেই সম্পদ অর্পন করা যাবে না যাদের হাতে পড়ে ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। এতে ইয়াতীম শিশু বা নিজের সন্তানের কোন পার্থক্য নেই। আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুও এ আয়াতের এরূপ তাফসীরই বর্ণনা করেছেন। [তাবারী] মোটকথা, মালের হেফাজত অত্যন্ত জরুরী এবং অপচয় করা গোনাহের কাজ। নিজের সম্পদের হেফাজত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সে শহীদের মর্যাদা পাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'নিজের মালের হেফাজত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সে শহীদ'। [বুখারীঃ ২৪৮০, মুসলিমঃ ১৪১] অর্থাৎ সওয়াবের দিক দিয়ে শহীদের মর্যাদা পাবে।

(২) আয়াতে শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা ও যোগ্যতা যাচাই করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ বালেগ হওয়ার আগেই ছোট ছোট দায়িত্ব দিয়ে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহের পর্যায়ে পৌঁছে অর্থাৎ বালেগ হয়। মোটকথা, বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক এবং যখন দেখ যে, তারা

آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ
اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا
اَنْ يَّكْبَرُوْا ؕ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ
بِالْمَعْرُوْفِ ؕ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ
فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ٦

যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের যোগ্য হয়; অতঃপর তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখতে পেলে(১) তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দাও(২)। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অপচয় করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংযত পরিমাণে ভোগ করে(৩)। অতঃপর তোমরা যখন

দায়িত্ব বহন করার যোগ্য হয়ে উঠেছে, তখন তাদের সম্পদ তাদের হাতে বুঝিয়ে দাও। সারকথা হচ্ছে, শিশুরা বিশেষ প্রকৃতি ও জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশের মাপকাঠিতে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। (এক) বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়, (দুই) বালেগ হওয়ার পরবর্তী সময়, (তিন) বালেগ হওয়ার আগেই জ্ঞান-বুদ্ধির যথেষ্ট বিকাশ। ইয়াতীম শিশুর অভিভাবকগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন তাঁরা শিশুর লেখাপড়া ও জীবন গঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বুদ্ধির বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে ছোট ছোট কাজ কারবার ও লেন-দেনের দায়িত্ব অর্পণ করে তাদের পরীক্ষা করতে থাকেন।

(১) এ বাক্য দ্বারা কুরআনের এ নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে যে, ইয়াতীম শিশুর মধ্যে যে পর্যন্ত বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ লক্ষ্য না কর, সে পর্যন্ত তাদের বিষয়-সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিও না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ ‘বুদ্ধি-বিবেচনা’র সময়সীমা কি? কুরআনের অন্য কোন আয়াতেও এর কোন শেষ সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এ জন্য কোন কোন ফিক্‌হবিদ মত প্রকাশ করেছেন যে, যদি কোন ইয়াতীমের মধ্যে যথেষ্ট বয়স হওয়ার পরও বুদ্ধি-বিবেচনার লক্ষণাদি দেখা না যায়, তবে অভিভাবক তার হাতে বিষয়-সম্পত্তি তুলে দিতে পারবে না। সমগ্র জীবন এ সম্পত্তি তাঁর তত্ত্বাবধানে রাখতে হলেও না।

(২) অর্থাৎ শিশু যখন বালেগ এবং বিয়ের যোগ্য হয়ে যায়, তখন তার অভিজ্ঞতা ও বিষয়-বুদ্ধি পরিমাপ করতে হবে। যদি দেখা যায়, সে তার ভালমন্দ বুঝবার মত যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে, তখন তার বিষয়-সম্পত্তি তার হাতে তুলে দাও।

(৩) আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর ইবন ‘আস বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার কোন সম্পদ নেই। আমার তত্ত্বাবধানে ইয়াতীম আছে, তার সম্পদ রয়েছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ তোমার ইয়াতীমের মাল থেকে তুমি খেতে পার, অপব্যয় ও অপচয় না করে, তার সম্পদকে তোমার সাথে না মিশিয়ে এবং তার সম্পদের বিনিময়ে তোমার সম্পদের হেফাজত না করে। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/১৮৬, ২১৫,

তাদেরকে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দিবে তখন সাক্ষী রেখো। আর হিসেব গ্রহণে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۝

৭. পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, সেটা অল্পই হোক বা বেশীই হোক, এক নির্ধারিত অংশ(১)।

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝

৮. আর সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়, ইয়াতীম এবং অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে তাদেরকে তা থেকে কিছু দিবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে(২)।

২১৬, আবু দাউদঃ ২৮৭২] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এ আয়াত ইয়াতীমের সম্পদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যদি কেউ ফকীর হয়, সে ইয়াতীমের সঠিক তত্ত্বাবধানের কারণে তা থেকে খেতে পারবে। [বুখারী: ৪৫৭৫; মুসলিম: ৩০১৯]

(১) এ আয়াতে কি পরিমাণ অংশ তারা পাবে তা বর্ণনা করা হয়নি। পক্ষান্তরে পরবর্তী ১১ নং আয়াত থেকে কয়েকটি আয়াত এবং এ সূরারই সর্বশেষ আয়াতে তা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এ আয়াত মুহকাম, এ আয়াত রহিত হয় নি। অর্থাৎ এর উপর আমল করতে হবে। [বুখারী: ৪৫৭৬] অন্য বর্ণনায় ইবন আব্বাস বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনগণকে তাদের মীরাস বন্টনের সময় আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধান এবং মিসকীনদের জন্য যদি মৃত ব্যক্তির কোন অসীয়ত থেকে থাকে, তবে সে অসীয়ত থেকে প্রদান করতে হবে। আর যদি অসীয়ত না থাকে, তবে তাদেরকে মীরাস থেকে কিছু পৌঁছাতে হবে। [তাবারী] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আবদুর রহমান ইবন আবী বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মীরাস বন্টনের সময় -আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তখনও জীবিত- আব্দুর রহমানের সন্তান আবদুল্লাহ ঘরে ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয়স্বজন সবাইকে তার পিতার মীরাস থেকে কিছু কিছু প্রদান করেন, এ হিসেবে যে, এখানে ﴿الْقِسْمَةَ﴾ শব্দের অর্থ, বন্টন। তারপর সেটা ইবন আব্বাসকে

৯. আর তারা যেন ভয় করে যে, অসহায় সন্তান পিছনে ছেড়ে গেলে তারাও তাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হত। কাজেই তারা যেন আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সঙ্গত কথা বলে।

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

১০. নিশ্চয় যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তো তাদের পেটে আগুনই খাচ্ছে; তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে(১)।

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١٠

দ্বিতীয় রুকূ'

১১. আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন(২)ঃ এক

يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ

জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, ঠিক করে নি। কারণ এটা অসীয়ত করার প্রতি নির্দেশ। এ আয়াতটিতে অসীয়তের কথাই বলা হয়েছে। যখন মাইয়্যেত তার সম্পদের ব্যাপারে অসীয়ত করতে চাইবে সে যেন নিঃস্ব, ইয়াতীম স্বজনদের না ভুলে সে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' [আত-তাফসীরুস সহীহ] সে হিসেবে এটি মৃত্যুর আগেই সম্পদের মালিকের করণীয় নির্দেশ করছে।

(১) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ পরিহার কর। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেগুলো কি? রাসূল বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, জাদু, অন্যায়ভাবে কোন প্রাণ সংহার করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করা, যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়ন করা এবং মুমিনা পবিত্রা নারীকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া।' [বুখারীঃ ২৭৬৬] সুতরাং ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করার শাস্তি কুরআন ও হাদীস উভয়ের দ্বারাই প্রমাণিত।

(২) ইসলাম-পূর্বকালে আরব ও অনারব জাতিসমূহের মধ্যে দুর্বল শ্রেণী, ইয়াতীম বালক-বালিকা ও অবলা নারী চিরকালই যুলুম-নির্যাতনের স্বীকার ছিল। প্রথমতঃ তাদের কোন অধিকারই স্বীকার করা হত না। কোন অধিকার স্বীকার করা হলেও পুরুষের কাছ থেকে তা আদায় করে নেয়ার সাধ্য কারো ছিল না। ইসলামই সর্বপ্রথম তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করে। এরপর সব অধিকার সংরক্ষণেরও চমৎকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। উত্তরাধিকার আইনেও জগতের সাধারণ জাতিসমূহ সমাজের উভয় প্রকার অঙ্গকে তাদের স্বাভাবিক ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। আরবদের নিয়মই ছিল এই যে, যারা অশ্বারোহন করে এবং শত্রুদের মোকাবিলা করে তাদের

الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا

পুত্রের(১) অংশ দুই কন্যার অংশের

অর্থ-সম্পদ লুট করার যোগ্যতা রাখে, তারাই শুধু মাত্র উত্তরাধিকারের যোগ্য হতে পারে। [রুহুল মা'আনী] বলাবাহুল্য, বালক-বালিকা ও নারী উভয় প্রকার দুর্বল শ্রেণী এ নিয়মের আওতায় পড়ে না। তাই তাদের নিয়ম অনুযায়ী শুধুমাত্র যুবক ও বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রই ওয়ারিশ হতে পারত। কন্যা কোন অবস্থাতেই ওয়ারিশ বলে গণ্য হত না, প্রাপ্ত বয়স্কা হোক কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা। পুত্র সন্তানও অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে সে উত্তরাধিকারের যোগ্য বলে বিবেচিত হত না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে একটি ঘটনা সংঘটিত হল, সা'দ ইবন রবী' রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ দু'টি সা'দ ইবন রবী'র কন্যা। তাদের বাবা আপনার সাথে উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেল। আর তাদের চাচা তাদের সমস্ত সম্পদ নিয়ে গেল। তাদের জন্য কোন সম্পদই বাকী রাখল না, অথচ সম্পদ না হলে তাদের বিয়েও হয় না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ্ এর ফয়সালা করবেন। ফলে মীরাসের আয়াত নাযিল হয়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের চাচার কাছে লোক পাঠান এবং বলেনঃ তুমি সা'দ-এর কন্যাদ্বয়কে দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদ এবং তাদের মা-কে এক-অষ্টমাংশ দিয়ে দাও। আর যা বাকী থাকবে তা তোমার। [আবু দাউদঃ ২৮৯১, ২৮৯২, তিরমিযীঃ ২০৯২. ইবন মাজাহ্‌ঃ ২৭২০, মুসনাদে আহমাদঃ ৩/৩৫২]

জাবের ইবন আব্দুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ আমি অসুস্থ হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসেন। আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিলাম, তিনি আমার উপর তার ওযুর পানি ছিটিয়ে দিলে আমি চেতনা ফিরে পেয়ে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, মীরাস কার জন্য? আমার তো কেবল 'কালালা'ই ওয়ারিশ হবে। অর্থাৎ আমার পিতৃকুলের কেউ বা সন্তান-সন্ততি নেই। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [বুখারীঃ ১৯৪, ৪৫৭৭, মুসলিমঃ ১৬১৬] অন্য এক বর্ণনায় ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ তখনকার সময়ে সম্পদ শুধু ছেলেকেই দেয়া হত আর পিতা-মাতার জন্য ছিল অসীয়ত করার নিয়ম। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তা পরিবর্তন করে যা তিনি পছন্দ করেন তা নাযিল করেন এবং ছেলেকে দুই মেয়ের অংশ দেন আর পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ও তিন ভাগের এক নির্ধারণ করেন। স্ত্রীর জন্য আট ভাগের এক ও চার ভাগের এক নির্দিষ্ট করেন। স্বামীকে অর্ধেক অথবা চার ভাগের এক অংশ দেন। [বুখারীঃ ৪৫৭৮]

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা নির্ধারিত ফরয অংশসমূহ দেয়ার পর সবচেয়ে কাছের পুরুষ লোককে প্রদান করবে' [মুসলিম: ১৬১৫] তাই পুত্রের তুলনায় পৌত্র অধিক অভাবগ্রস্ত হলেও أَقْرَبُوْنَ এর আইনের দৃষ্টিতে সে ওয়ারিশ হতে পারে না। কেননা, পুত্রের উপস্থিতিতে সে নিকটতম আত্মীয় নয়। কুরআনে উল্লেখিত মূলনীতির ভিত্তিতে ইয়াতীম পৌত্রের উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্নটির

مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَّوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ

সমান; কিন্তু শুধু কন্যা দুইয়ের বেশী থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু’ভাগ, আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধেক(১)। তার সন্তান

অকাট্য সমাধান আপনা-আপনি বের হয়ে আসে। তার অভাব দূর করার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এমনি এক ব্যবস্থা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে। এ প্রশ্নে প্রাশ্চাত্যভক্ত নবশিক্ষিতদের ছাড়া কেউ দ্বিমত করেনি। সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় আজ পর্যন্ত কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে এ কথাই বুঝে এসেছে যে, পুত্র বিদ্যমান থাকা অবস্থায় পৌত্র উত্তরাধিকার স্বত্ব পাবে না, তার পিতা বিদ্যমান থাকুক অথবা মারা যাক। এখন কুরআনী ব্যবস্থার সৌন্দর্য লক্ষ্য করুন। একদিকে স্বয়ং কুরআনেরই বর্ণিত সুবিচারভিত্তিক বিধান এই যে, নিকটবর্তী আত্নীয় বর্তমান থাকলে দূরবর্তী আত্নীয় বঞ্চিত হবে, অপরদিকে বঞ্চিত দূরবর্তী আত্নীয়ের মনোবেদনা ও নৈরাশ্যকেও উপেক্ষা করা হয়নি। এর জন্য একটি স্বতন্ত্র আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ “যেসব দূরবর্তী, ইয়াতীম, মিসকীন পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যদি তারা বন্টনের সময় উপস্থিত থাকে, তবে অংশীদারদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে এ মাল থেকে স্বেচ্ছায় তাদেরকে কিছু দিয়ে দেয়া। এটা তাদের জন্য এক প্রকার সদকা ও সওয়াবের কাজ”। [সূরা আন-নিসাঃ ৮] তাছাড়া ইসলাম অসীয়ত করার একটি দায়িত্ব মানুষকে দিয়েছে। দাদা যখনই তার নাতিকে বঞ্চিত দেখবে, তখন তার উচিত হবে এক তৃতীয়াংশের মধ্যে তার জন্য অসিয়ত করা। [আত-তাফসীরুস সহীহ] কারণ, ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত নেই্ সুতরাং অসিয়তের সর্বোত্তম ক্ষেত্র হচ্ছে, নিকটাত্নীয় অথচ কোন কারণে ওয়ারিশ হচ্ছে না, এমন লোকদের জন্য তা গুরুত্বের সাথে সম্পাদন করা। এ রকম অবস্থায় অসিয়ত করা কোন কোন আলেমের নিকট ওয়াজিব।

(১) কুরআনুল কারীম কন্যাদেরকে অংশ দেয়ার প্রতি এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, কন্যাদের অংশকে আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করে এর অনুপাতে পুত্রদের অংশ ব্যক্ত করেছে। অর্থাৎ ‘দুই কন্যার অংশ এক পুত্রের অংশের সমপরিমাণ’ বলার পরিবর্তে ‘এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমপরিমাণ’ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অনেকেই বোনদেরকে অংশ দেয় না এবং বোনেরা এ কথা চিন্তা করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চক্ষুলজ্জার খাতিরে ক্ষমা করে দেয় যে, পাওয়া যখন যাবেই না, তখন ভাইদের সাথে মন কষাকষির দরকার কি। এরূপ ক্ষমা শরী‘য়তের আইনে ক্ষমাই নয়; ভাইদের জিম্মায় তাদের হক পাওনা থেকে যায়। যারা এভাবে ওয়ারিশী স্বত্ব আত্নসাৎ করে, তারা কঠোর গোনাহ্‌গার। তাদের মধ্যে আবার নাবালেগা কন্যাও থাকে। তাদেরকে অংশ না দেয়া দ্বিগুণ গোনাহ্। এক গোনাহ্ শরী‘য়তসম্মত ওয়ারিশের অংশ আত্নসাৎ করার এবং দ্বিতীয় গোনাহ্ ইয়াতীমের সম্পত্তি হজম করে ফেলার। এরপর আরো ব্যাখ্যা সহকারে কন্যাদের অংশ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, যদি পুত্র সন্তান না থাকে, শুধু

الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهٗٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ ۚ
لَا تَدْرُوْنَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ
اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ⑪

থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ; সে নিঃসন্তান হলে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ; তার ভাই-বোন থাকলে মাতার জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ(১); এ সবই সে যা ওসিয়াত করে তা দেয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর(২)। তোমাদের

একাধিক কন্যাই থাকে, তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে। এতে সব কন্যাই সমান অংশীদার হবে। অবশিষ্ট তিন ভাগের এক অন্যান্য ওয়ারিশ যেমন মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতা, স্ত্রী অথবা স্বামী প্রমূখ পাবে। কন্যাদের সংখ্যা দুই বা তার বেশী হলে দুই-তৃতীয়াংশের মধ্যে তারা সমান অংশীদার হবে।

(১) কাতাদা বলেন, সন্তানরা মাকে এক তৃতীয়াংশ থেকে কমিয়ে এক ষষ্টাংশে নিয়ে এসেছে, অথচ তারা নিজেরা ওয়ারিশ হয় নি। যদি একজন মাত্র সন্তান থাকে তবে সে তার মায়ের অংশ কমাবে না। কেবল একের অধিক হলেই কমাবে। আলেমগণ বলেন, মায়ের অংশ কমানোর কারণ হচ্ছে, মায়ের উপর তাদের বিয়ে বা খরচের দায়িত্ব পড়ে না। তাদের বিয়ে ও খরচ-পাতির দায়িত্ব তাদের বাপের উপর। তাই তাদের মায়ের অংশ কমানো যথার্থ হয়েছে। [তাবারী; ইবনে কাসীর; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) এখানে শরী'আতের নীতি হচ্ছে এই যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে প্রথমে শরী'আত অনুযায়ী তার কাফন-দাফনের ব্যয় নির্বাহ করা হবে। এতে অপব্যয় ও কৃপণতা উভয়টি নিষিদ্ধ। এরপর তার ঋণ পরিশোধ করা হবে। যদি ঋণ সম্পত্তির সমপরিমাণ কিংবা তারও বেশী হয়, তবে কেউ ওয়ারিশী স্বত্ব পাবে না এবং কোন ওসিয়ত কার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে যদি ঋণ পরিশোধের পর সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে কিংবা ঋণ একেবারেই না থাকে, তবে সে কোন ওসিয়ত করে থাকলে এবং তা গোনাহ্‌র ওসিয়ত না হলে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে তা কার্যকর হবে। যদি সে তার সমস্ত সম্পত্তি ওসিয়ত করে যায় তবুও এক-তৃতীয়াংশের অধিক ওসিয়ত কার্যকর হবে না। মোটকথা ঋণ পরিশোধের পর এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে ওসিয়ত কার্যকর করে অবশিষ্ট সম্পত্তি শরী'আতসম্মত ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। ওসিয়ত না থাকলে ঋণ পরিশোধের পর সমস্ত সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ] বন্টনের ব্যাপারে হাদীসে এসেছে, মিকদাম ইবন মা'দীকারব বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সবচেয়ে নিকটতমের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন, তারপর পরের নিকটতম ব্যক্তি। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/১৩১]

পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তা তোমরা জান না[১] । এ বিধান আল্লাহ্‌র; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ
وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً
أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ
مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

১২. তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে এবং তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ; ওসিয়াত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর । তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ, আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ; তোমরা যা ওসিয়াত করবে তা দেয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর[২] ।

---

(১) অর্থাৎ তোমাদের পিতা ও সন্তানের মধ্যে কার দ্বারা তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতে সবচেয়ে বেশী লাভবান হবে, তা বলতে পার না । [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবন আব্বাস বলেন, তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে যে আল্লাহ্‌র বেশী অনুগত, সে কিয়ামতের দিন বেশী উঁচু স্তরে অবস্থান করবে; কেননা আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের পরস্পরের জন্য পরস্পরের সুপারিশ গ্রহণ করবেন । [তাবারী]

(২) উপরোক্ত বর্ণনায় স্ত্রীর অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে । প্রথমে স্বামীর অংশ ব্যক্ত করা হয়েছে । মৃতা স্ত্রীর যদি কোন সন্তান না থাকে, তবে ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়ত কার্যকর করার পর স্বামী তার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে । অবশিষ্ট অর্ধেক থেকে অন্যান্য ওয়ারিশ যেমন মৃতার পিতা-মাতা, ভাই-বোন যথারীতি অংশ পাবে । মৃতার যদি সন্তান থাকে, এক বা একাধিক - পুত্র বা কন্যা, এ স্বামীর ঔরসজাত হোক বা পূর্ববর্তী কোন স্বামীর ঔরসজাত, তবে বর্তমান স্বামী ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়ত কার্যকর করার পর মৃতার সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে । অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ অন্যান্য ওয়ারিশরা পাবে । পক্ষান্তরে যদি স্বামী মারা যায় এবং তার কোন সন্তান না থাকে, তবে ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়ত কার্যকর করার পর স্ত্রী মোট সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে । আর যদি মৃত স্বামীর সন্তান থাকে, এ স্ত্রীর গর্ভজাত হোক কিংবা অন্য স্ত্রীর, তবে ঋণ পরিশোধ ও

আর যদি কোন পুরুষ অথবা নারীর ‘কালালাহ্⁽¹⁾’ বা পিতা-মাতা ও সন্তানহীন উত্তরাধিকারী হয়, আর থাকে তার এক বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন, তবে প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। তারা এর বেশী হলে সবাই সমান অংশীদার হবে তিন ভাগের এক ভাগে; এটা যা ওসিয়াত করা হয় তা দেয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর, কারো ক্ষতি না করে⁽²⁾। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

ওসিয়ত কার্যকর করার পর স্ত্রী আট ভাগের এক ভাগ পাবে। স্ত্রী একাধিক হলেও উপরোক্ত বিবরণ অনুযায়ী এক অংশ সকল স্ত্রীর মধ্যে সমহারে বন্টন করা হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রীই এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-অষ্টমাংশ পাবে না, বরং সবাই মিলে এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-অষ্টমাংশে অংশীদার হবে। উভয় অবস্থাতে স্বামী অথবা স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা তাদের অন্যান্য ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করা হবে। তবে প্রথমে দেখা উচিত যে, যদি স্ত্রীর মাহ্‌র পরিশোধ করা না হয়ে থাকে, তবে অন্যান্য ঋণের মতই প্রথমে মোট পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে মাহ্‌র পরিশোধ করার পর ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করা হবে। মোহারানা দেয়ার পর স্ত্রী ওয়ারিশী স্বত্বে অংশীদার হবার দরুন এ অংশও নেবে। মাহ্‌র পরিশোধ করার পর যদি মৃত স্বামীর সম্পত্তি অবশিষ্ট না থাকে, তবে অন্যান্য ঋণের মত সম্পূর্ণ সম্পত্তি মাহ্‌র বাবদ স্ত্রীকে সমর্পণ করা হবে এবং কোন ওয়ারিশই অংশ পাবে না।

(১) আলোচ্য আয়াতে ‘কালালাহ্’র পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে। ‘কালালাহ্’র অনেক সংজ্ঞা রয়েছে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যে মৃত ব্যক্তির উর্ধ্বতন ও অধঃস্তন কেউ নেই, সে-ই ‘কালালাহ্’। [তাবারী]

(২) ‘কারো ক্ষতি না করে’ এ কথার দু’টি দিক আছে। প্রথমত, মৃত ব্যক্তি যেন ওসিয়ত বা ঋণের মাধ্যমে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। ওসিয়ত করা কিংবা নিজের যিম্মায় ভিত্তিহীন ঋণ স্বীকার করার মাধ্যমে ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা লুকায়িত না রাখে। এ রকমের ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও কবিরা গোনাহ। দ্বিতীয়ত, যারা কালালাহ জনিত ওয়ারিশ তারাও যেন মৃত ব্যক্তির ন্যায়সঙ্গত অসিয়ত কার্যকরণে কোন প্রকার বাধা না দেয়। ইবন আব্বাস বলেন, ওসিয়্যতে ক্ষতিগ্রস্ত করা কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। [তাবারী]

১৩. এসব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ্ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তারা সেখানে স্থায়ী হবে আর এটাই হলো মহাসাফল্য।

تِلۡكَ حُدُوۡدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنۡ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ
يُدۡخِلۡهُ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ
خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا ؕ وَذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ ﴿١٣﴾

১৪. আর কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করলে তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে(১)।

وَمَنۡ يَّعۡصِ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوۡدَهٗ
يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَالِدًا فِيۡهَا ۖ وَلَهٗ عَذَابٌ
مُّهِيۡنٌ ﴿١٤﴾ ع

তৃতীয় রুকূ’

১৫. আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী তলব করবে(২)। যদি তারা সাক্ষ্য

وَالّٰتِىۡ يَاۡتِيۡنَ الۡفَاحِشَةَ مِنۡ نِّسَآٮِٕكُمۡ
فَاسۡتَشۡهِدُوۡا عَلَيۡهِنَّ اَرۡبَعَةً مِّنۡكُمۡ ۚ فَاِنۡ
شَهِدُوۡا فَاَمۡسِكُوۡهُنَّ فِى الۡبُيُوۡتِ حَتّٰى

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা তথা ওয়ারিশী নীতির ব্যাপারে যে বিধান দেয়া হয়েছে তা লঙ্ঘন করবে তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। কেননা সে আল্লাহ্‌র হুকুমকে পরিবর্তন করেছে, আল্লাহ্‌র বিধানের বিরোধিতা করেছে। তখনই কেউ এরূপ করতে পারে যখন সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের উপর অসন্তুষ্ট থাকে। এজন্য আল্লাহ্ তাকে চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা দ্বারা শাস্তি দিবেন।

(২) এখানে এমন পুরুষ ও নারীদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, যারা নির্লজ্জ কাজ অর্থাৎ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। বলা হয়েছে, যেসব নারী দ্বারা এমন কুকর্ম সংঘটিত হয়, তাদের এ কাজ প্রমাণ করার জন্য চার জন পুরুষ সাক্ষী তলব করতে হবে। অর্থাৎ যেসব বিচারকের কাছে এই মামলা পেশ করা হয়, তারা প্রমাণের জন্য চার জন যোগ্য সাক্ষী তলব করবেন এবং এই সাক্ষীদের পুরুষ শ্রেণী থেকে হওয়াও জরুরী। এ ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যভিচারের সাক্ষীদের ব্যাপারে শরী‘আত দু’রকম কঠোরতা করেছে যেহেতু ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এতে ইজ্জত ও আবরু আহত হয় এবং পারিবারিক মানসম্ভ্রমের প্রশ্ন দেখা দেয়, তাই প্রথমে শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, এমন ক্ষেত্রে শুধু পুরুষই সাক্ষী হতে হবে - নারীদের সাক্ষ্য ধর্তব্য

يَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿١٥﴾

দেয় তবে তাদেরকে ঘরে অবরুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় বা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করেন(১)।

وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿١٦﴾

১৬. আর তোমাদের মধ্যে যে দুজন এতে লিপ্ত হবে তাদেরকে শাস্তি দেবে। যদি তারা তাওবাহ্ করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় তবে তাদের থেকে বিরত থাকবে(২)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম তাওবাহ্ কবুলকারী, পরম দয়ালু।

নয়। দ্বিতীয়তঃ চার জন পুরুষ হওয়া জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এ শর্তটি খুবই কঠোর। দৈবাৎ ও কদাচিৎ তা পাওয়া যেতে পারে। এ শর্ত আরোপের কারণ, যাতে স্ত্রীর স্বামী, তার জননী অথবা অন্য স্ত্রী অথবা ভাই-বোন ব্যক্তিগত জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে অহেতুক অপবাদ আরোপ করার সুযোগ না পায় অথবা অন্য অমঙ্গলকামী লোকেরা শত্রুতাবশতঃ অপবাদ আরোপ করতে সাহসী না হয়। কেননা, চার জনের কম পুরুষ ব্যভিচারের সাক্ষ্য দিলে তাদের সাক্ষী গ্রহণীয় নয়। এমতাবস্থায় বাদী ও সাক্ষীরা সবাই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে এবং একজন মুসলিমের চরিত্রে কলংক আরোপ করার দায়ে তাদেরকে 'হদ্দে-কযফ' বা অপবাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

(১) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, তখনকার দিনে কোন মহিলা ব্যভিচার করলে, সে আমৃত্যু ঘরে বন্দী জীবন যাপন করত। [তাবারী] তিনি আরও বলেন, এখানে যে ব্যবস্থার ওয়াদা করেছেন সূরা আন-নূরে আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যবস্থা করেছেন। তিনি অবিবাহিতদের জন্য বেত্রাঘাত এবং বিবাহিতদের জন্য পাথরের আঘাতে নিহত করা দ্বারা এ আয়াতকে রহিত করেছেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীসে সুস্পষ্টভাবে তার নির্দেশ এসেছে। [দেখুন- মুসলিমঃ ১৬৯০, আবু দাউদঃ ৪৪১৫, তিরমিযীঃ ১৪৩৪, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩১৮]

(২) ইবন আব্বাস বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে কেউ ব্যভিচার করলে, তাকে তা'যীর বা অনির্ধারিত শাস্তি দেয়া হত। তাকে জুতো মারা হতো। পরবর্তীতে নাযিল হলো, 'ব্যভিচারিনী মহিলা ও ব্যভিচারী পুরুষ তাদের উভয়কে একশত বেত্রাঘাত কর' [সূরা আন-নূর:২] কিন্তু যদি তারা বিবাহিত হয়, তবে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত অনুসারে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। আর এটাই হচ্ছে এ আয়াতে বর্ণিত ব্যবস্থা। [তাবারী]

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰٓئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٧

১৭. আল্লাহ্ অবশ্যই সেসব লোকের তাওবাহ্ কবুল করবেন যারা অজ্ঞতাবশতঃ(১) মন্দ কাজ করে এবং তাড়াতাড়ি তাওবাহ্ করে, এরাই তারা, যাদের তাওবাহ্ আল্লাহ্ কবুল করেন(২)। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

---

(১) এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কুরআনুল কারীমে ﴿بِجَهَالَةٍ﴾ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায়, অজ্ঞাতসারে এবং না জেনে-শুনে গোনাহ্ করলে তাওবা কবুল হবে এবং জ্ঞাতসারে জেনে-শুনে গোনাহ্ করলে তাওবা কবুল হবে না। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম এ আয়াতের যে তাফসীর করেছেন তা এই যে, এখানে আয়াতের ﴿بِجَهَالَةٍ﴾ অর্থ এই নয় যে, সে গোনাহ্র কাজটি যে গোনাহ্, তা জানে না কিংবা গোনাহ্র ইচ্ছা নেই; বরং অর্থ এই যে, গোনাহ্র অশুভ পরিণাম ও আখেরাতের আযাবের ব্যাপারে গাফেল বা অসতর্কতাই তার গোনাহ্র কাজ করার কারণ; যদিও গোনাহ্টি যে গোনাহ্, তা সে জানে এবং তার ইচ্ছাও করে। তাই جهالة শব্দটি এখানে নির্বুদ্ধিতা ও বোকামির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবুল আলিয়া ও কাতাদাহ্র বর্ণনা মতে সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, 'বান্দা যে গোনাহ্ করে- অনিচ্ছাকৃত করুক কিংবা ইচ্ছাকৃত, সর্বাবস্থায়ই তা মূর্খতা'। তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন কাজে আল্লাহ্র নাফরমানী করছে, সে দৃশ্যতঃ বড় আলেম ও বিশেষ জানা-শোনা বিচক্ষণ হলেও সে কাজ করার সময় মূর্খই হয়ে যায়'। ইকরিমা বলেন, দুনিয়ার যেসব কাজ আল্লাহ্র আনুগত্যের বাইরে, সেগুলো সবই মূর্খতা। কারণ এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাফরমানী করে, সে ক্ষণস্থায়ী সুখকে চিরস্থায়ী সুখের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে। যে ব্যক্তি এই ক্ষণস্থায়ী সুখের বিনিময়ে চিরস্থায়ী কঠোর আযাব ক্রয় করে, তাকে বুদ্ধিমান বলা যায় না। তাকে সবাই মূর্খ বলবে, যদিও সে ভালভাবে জানা ও বোঝার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে সে কুকর্ম সম্পাদন করে। মোটকথা, গোনাহ্র কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে হোক কিংবা ভুলক্রমে, উভয় অবস্থাতেই তা মূর্খতাবশতঃ সম্পন্ন হয়। এ কারণেই সাহাবা, তাবেয়ীন ও সমগ্র উম্মতের এ ব্যাপারে ইজমা বা ঐকমত্য রয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন গোনাহ্ করে, শর্তসাপেক্ষে তার তাওবাও কবুল হতে পারে। তাছাড়া আয়াতের আরেক অর্থ এও হতে পারে যে, তারা গোনাহ করার সময় এর পরিণাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে না। অথবা সে অপরাধ করার সময় আল্লাহ্ যে তাকে দেখছেন সে ব্যাপারে বেখবর হয়ে পড়ে। অথবা সে যখন অপরাধ করে তখন যে তার ঈমানের মধ্যে দূর্বলতা আসবে সে সম্পর্কে গাফেল হয়ে পড়ে। [তাফসীরে সা'দী]

(২) এখানে তাড়াতাড়ি তাওবাহ্ করা শর্তের অর্থ হলো দু'টি- (এক) মৃত্যুর বড় শ্বাস বের না হওয়ার আগ পর্যন্ত করা। [তিরমিযীঃ ৩৫৩৭, ইবন মাজাহ্ঃ ৪২৫৩] (দুই) সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত করা। [দেখুন, সূরা আল-আন'আম: ১৫৮]

১৮. তাওবাহ্ তাদের জন্য নয় যারা আজীবন মন্দ কাজ করে, অবশেষে তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, 'আমি এখন তাওবাহ্ করছি' এবং তাদের জন্যও নয়, যাদের মৃত্যু হয় কাফের অবস্থায়। এরাই তারা যাদের জন্য আমরা কষ্টদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করেছি(১)।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰىٓ اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۭ اُولٰۗىِٕكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ⑱

১৯. হে ঈমানদারগণ! যবরদস্তি করে(২)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۗءَ

---

(১) ইবন আব্বাস বলেন, এ আয়াত এবং ৪৮ নং আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাফের অবস্থায় যারা মারা যাবে তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। পক্ষান্তরে যাদের তাওহীদ ঠিক আছে তাদেরকে তিনি তাঁর ইচ্ছার উপর রেখেছেন। তাদেরকে তিনি ক্ষমা থেকে নিরাশ করেন নি। [তাবারী]

(২) ইসলামপূর্ব যুগে পুরুষ নিজেকে স্ত্রীর জান ও মালের মালিক মনে করতো। স্ত্রী যার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতো, সে তার প্রাণকে নিজের মালিকানাধীন মনে করতো। স্বামীর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশরা যেমন তার ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিশ ও মালিক হতো, তেমনি তার স্ত্রীরও ওয়ারিশ ও মালিক বলে গণ্য হতো। ইচ্ছা করলে নিজেই তাকে বিয়ে করতো কিংবা অন্যের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে তাকে বিয়ে দিয়ে দিতো। স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র নিজেও পিতার মৃত্যুর পর তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারতো। স্ত্রীর প্রাণেরই এই অবস্থা, তখন তার ধন-সম্পদের ব্যাপারটি তো বলাই বাহুল্য। যেসব অর্থ-সম্পদ স্ত্রী উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা পিত্রালয় থেকে উপঢৌকন হিসেবে লাভ করতো, তারা সেগুলো হজম করে ফেলতো। যদি কোন নারী তার নিজের অংশের ধন-সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই নিত, তবে পুরুষরা তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধা দিত; যাতে সে এখানেই মারা যায় এবং ধন-সম্পদ তাদের অধিকারভুক্ত থেকে যায়। কোন কোন সময় স্ত্রীর কোন দোষ না থাকলেও তাকে তার প্রাপ্য প্রদান করতো না। আবার তালাক দিয়েও তাকে মুক্ত করত না। তালাক দিলেও অন্যত্র বিয়ে দিত না। যাতে তার মাহ্‌রের টাকা বাইরে না যায়। ইসলাম এসব কিছুর মুলোৎপাটন করে দিয়েছে। এ আয়াত সংক্রান্ত বেশ কিছু বর্ণনায় তা স্পষ্ট। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ইসলামপূর্বযুগে কোন লোক মারা গেলে তার অভিভাবকরা তার স্ত্রীর অধিকারী হয়ে যেত। সে ইচ্ছে করলে তাকে বিয়ে করত অথবা অন্যের নিকট বিয়ে দিয়ে দিত। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। [বুখারী: ৪৫৭৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, কায়েস ইবন সালত এর পিতা মারা গেলে তার ছেলে তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করতে চাইল। জাহেলিয়াতে যা তাদের অভ্যাস ছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [নাসায়ী: ১১৫]

كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ
اٰتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسٰىٓ
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

নারীদের উত্তরাধিকার হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না, যদি না তারা স্পষ্ট খারাপ আচরণ করে(১)। আর তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে(২); তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ্ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ(৩)।

---

(১) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এখানে স্পষ্ট খারাপ আচরণ বলতে, স্বামীর অবাধ্যতা ও স্বামীর সাথে শত্রুতা বোঝানো হয়েছে। যে মহিলা স্বামীর অবাধ্য সে মহিলা থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য পুরুষটি তাকে দেয়া সম্পদ ফেরৎ নিতে পারবে। [তাবারী]

(২) অর্থাৎ তাদের সাথে উত্তম কথা বলবে। কথায়, কাজে, চলাফেরায় যতটুকু সম্ভব সৌন্দর্য রক্ষা করবে। যেমনটি তুমি তাদের কাছ থেকে আশা কর, তেমন ব্যবহারই করো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো ঐ ব্যক্তি যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আমি আমার পরিবারের কাছে উত্তম। [তিরমিযীঃ ৩৮৯৫] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক সৌন্দর্যের মধ্যে এটা ছিল যে, তিনি সদাহাস্য সুন্দর ব্যবহার করতেন। পরিবারের সাথে হাস্যরস, নরম ব্যবহার ইত্যাদি করতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার সাথে কখনো কখনো দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। [দেখুন- আবু দাউদঃ ২৫৭৮, ইবন মাজাহ্ঃ ১৯৭৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৬/১২৯]

(৩) অর্থাৎ এমনও হতে পারে যে, ধৈর্যধারণ করে তাদের সাথে জীবনযাপন করলে দুনিয়াতে এবং আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলা অনেক ভাল কিছু এর বিনিময়ে রেখেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা এই আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ এর অর্থ হল স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসবে, তারপর তাদের মধ্যে আল্লাহ্ সন্তান দান করবেন যে সন্তান তাদের মধ্যে প্রভূত কল্যাণ নিয়ে আসবেন বা স্বামীর মনে স্ত্রীর জন্য ভালবাসা তৈরী করে দিবেন। [তাবারী] এছাড়া হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'মুমিন পুরুষ কোন মুমিন নারীকে ঘৃণা করবে না। যদি তার কোন চরিত্রের কোন একটি দিক তাকে অসন্তুষ্ট করে, তবে অন্য দিক তাকে সন্তুষ্ট করবে। [মুসলিমঃ ১৪৬৯]

২০. আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর জায়গায় অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাদের একজনকে অনেক অর্থও(১) দিয়ে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা তা গ্রহণ করবে?

وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ إِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا أَتَأْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٢٠﴾

২১. আর কিভাবে তোমরা তা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা একে অপরের সাথে সংগত হয়েছ এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি(২) নিয়েছে?

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ أَفْضٰى بَعْضُكُمْ إِلٰى بَعْضٍ وَّأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿٢١﴾

২২. নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃ পুরুষ যাদেরকে বিয়ে করেছে, তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না(৩); তবে পূর্বে যা সংঘটিত হয়েছে

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا وَّسَاءَ سَبِيْلًا ﴿٢٢﴾

---

(১) এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মাহ্‌র হিসাবে অনেক সম্পদ দেয়াও জায়েয। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বেশী পরিমাণে মাহ্‌র দিতে নিষেধ করতেনঃ। তিনি বলতেনঃ তোমরা মহিলাদের মাহ্‌র নির্ধারণে সীমালংঘন করো না। কেননা, এটা যদি দুনিয়াতে সম্মানের ব্যাপার হত অথবা আল্লাহ্‌র নিকট তাকওয়ার বিষয় হত, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামই এ কাজের সবেচেয়ে বেশী উপযুক্ত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার উকিয়ার বেশী তার কোন স্ত্রীকেও দেননি এবং কন্যাদের জন্যও গ্রহণ করেন নি। এমনকি কখনো কখনো মানুষ স্ত্রীর মাহ্‌র দিতে গিয়ে নিজেই নিজের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। [আবু দাউদঃ ২১০৬, তিরমিযীঃ ১১১৪]

(২) কাতাদা বলেন, দৃঢ় প্রতিশ্রুতি বা পাকাপোক্ত অঙ্গীকার বলে বিয়ে বুঝানো হয়েছে। কারণ বিয়ের সময় মাহ্‌র দেয়া এবং স্ত্রীকে সঠিকভাবে পরিচালনা কিংবা সুন্দরভাবে বিদায় করার অঙ্গীকার করার মত চুক্তি সংঘটিত হয়ে থাকে। [তাফসীর আবদির রাযযাক] সুতরাং একে অপরের সাথে মেলামেশা ও চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর এ জাতীয় আচরণ অমানবিক ও অগ্রহণযোগ্য।

(৩) জাহেলিয়াত যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে পুত্ররা বিনাদ্বিধায় বিয়ে করে নিত। [দেখুন- বুখারীঃ ৪৫৭৯] এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই নির্লজ্জ কাজটি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং একে 'আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণ' বলে অভিহিত করেছেন। বলাবাহুল্য, যাকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মা বলা হয়, পিতার মৃত্যুর পর তাকে স্ত্রী করে রাখা

(সেটা ক্ষমা করা হলো) নিশ্চয় তা ছিল অশ্লীল, মারাত্মক ঘৃণ্য(১) ও নিকৃষ্ট পন্থা।

চতুর্থ রুকূ’

২৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে(২) তোমাদের মা(৩), মেয়ে(৪),

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ

মানব-চরিত্রের জন্য অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আলেমগণ বলেন, পিতা কোন নারীকে বিয়ে করার সাথে সাথেই সন্তানদের জন্য সে নারী হারাম হয়ে যাবে। চাই তার সাথে পিতার সহবাস হোক বা না হোক। অনুরূপভাবে যে নারীকে পুত্র বিয়ে করেছে সেও পিতার জন্য হারাম হয়ে যাবে, তার সাথে পুত্রের সহবাস হোক বা না হোক [তাবারী]

(১) আবু বুরদাহ্ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মতান্তরে হারেস ইবন ‘আমের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পাঠিয়েছেন এমন লোকের কাছে যে তার পিতার মৃত্যুর পরে পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছে- যেন তাকে হত্যা করা হয় এবং তার যাবতীয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। [আবু দাউদঃ ৪৪৫৭, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/২৯৭, তিরমিযীঃ ১৩৬২, ইবন মাজাহ্ঃ ২৬০৭]

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহে যাদের সাথে বিয়ে হারাম, এমন নারীদের বিবরণ দেয়া হয়েছে। তারা তিনভাগে বিভক্তঃ এক. ঐ সমস্ত হারাম নারী কোন অবস্থাতেই হালাল হয় না, তাদেরকে ‘মুহার্‌রামাতে আবাদীয়্যা’ বা ‘চিরতরে হারাম মহিলা’ বলা হয়। এ জাতীয় মহিলা তিন শ্রেণীরঃ (১) বংশগত হারাম নারী, (২) দুধের কারণে হারাম নারী এবং (৩) শ্বশুর সম্পর্কের কারণে হারাম নারী চিরতরে হারাম। দুই. কোন কোন নারী চিরতরে হারাম নয়, কোন কোন অবস্থায় তারা হালালও হয়ে যায়। তাদেরকে ‘মুহাররামাতে মুআক্কাতাহ’ বা সাময়িক কারণে হারাম বলা হয়। এরা আবার দু’ শ্রেণীতে বিভক্তঃ (১) পরস্ত্রী সে যতক্ষণ পর্যন্ত পরের স্ত্রী থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম। কিন্তু যখনই অপরের স্ত্রী হওয়া থেকে মুক্ত হবে তখনই সে হালাল হয়ে যাবে। (২) কোন কোন মহিলা শুধুমাত্র অন্যের সাথে একসাথে বিবাহ করা হারাম। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিবাহ করা হারাম নয়। যেমন, দুই বোনকে একসাথে স্ত্রী হিসেবে রাখা। খালা ও বোনঝিকে একসাথে স্ত্রী হিসেবে রাখা।

(৩) অর্থাৎ আপন জননীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে। অর্থের ব্যাপকতায় দাদী, নানী সবই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(৪) স্বীয় ঔরসজাত কন্যাকে বিয়ে করা হারাম। কন্যার কন্যাকে এবং পুত্রের কন্যাকেও বিয়ে করা হারাম। মোটকথা, কন্যা, পৌত্রী, প্রপৌত্রী, দৌহিত্রী, প্রদৌহিত্রী এদের সবাইকে বিয়ে করা হারাম।

وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ
اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهٰتُ

বোন(১), ফুফু(২), খালা(৩), ভাইয়ের মেয়ে(৪), বোনের মেয়ে(৫), দুধমা(৬), দুধবোন(৭), শাশুড়ী ও তোমাদের

---

(১) সহদোরা বোনকে বিয়ে করা হারাম। এমনিভাবে বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোনকেও বিয়ে করা হারাম।

(২) পিতার সহোদরা, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোনকে বিয়ে করা হারাম। তিন প্রকার ফুফুকেই বিয়ে করা যায় না।

(৩) আপন জননীর তিন প্রকার বোন, প্রত্যেকের সাথেই বিয়ে করা হারাম।

(৪) ভ্রাতুষ্পুত্রীর সাথেও বিয়ে হারাম; আপন হোক বৈমাত্রেয় হোক - বিয়ে হালাল নয়।

(৫) বোনের কন্যা অর্থাৎ ভাগ্নেয়ীর সাথেও বিয়ে হারাম। এখানেও বোনকে ব্যাপক অর্থে বুঝতে হবে।

(৬) যেসব নারীর স্তন্য পান করা হয়, তারা জননী না হলেও বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে জননীর পর্যায়ভুক্ত এবং তাদের সাথে বিবাহ হারাম। ফেকাহ্‌বিদগণের পরিভাষায় একে ‘হুরমাতে রেযাআত’ বলা হয়। তবে কেবলমাত্র শিশু অবস্থায় দুধ পান করলেই এই ‘হুরমাত’ কার্যকরী হয়।

(৭) অর্থাৎ দুধ পানের সাথে সম্পর্কিত যেসব বোন আছে, তাদেরকে বিয়ে করা হারাম। এর বিশদ বিবরণ এই যে, দুধ পানের নির্দিষ্ট সময়কালে কোন বালক অথবা বালিকা কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে সে তাদের মা এবং তার স্বামী তাদের পিতা হয়ে যায়। এছাড়া সে স্ত্রীলোকের আপন পুত্র-কন্যা তাদেরই ভাই-বোন হয়ে যায়। অনুরূপ সে স্ত্রীলোকের বোন তাদের খালা হয় এবং সে স্ত্রীলোকের দেবর-ভাসুররা তাদের চাচা হয়ে যায়। তার স্বামীর বোনেরা শিশুদের ফুফু হয়ে যায়। দুধ পানের কারণে তাদের সবার পরস্পরের বৈবাহিক অবৈধতা স্থাপিত হয়ে যায়। বংশগত সম্পর্কের কারণে পরস্পর যেসব বিয়ে হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্কের কারণে সেসব সম্পর্কীদের সাথে বিয়ে করা হারাম হয়ে যায়। তাই একটি বালক ও একটি বালিকা কোন মহিলার দুধ পান করলে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না। এমনিভাবে দুধভাই ও বোনের কন্যার সাথেও বিয়ে হতে পারে না। উকবা ইবন হারেস বলেন, তিনি আবি ইহাব ইবন আযীযের এক মেয়েকে বিয়ে করেন। এক মহিলা এসে বলল, আমি উকবাকে এবং যাকে সে বিয়ে করেছে উভয়কে দুধ পান করিয়েছি। উকবা বললেন, আমি জানি না যে, আপনি আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। এর পূর্বে আপনি আমাকে কখনো বলেননি। তারপর তিনি মদীনায় আসলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কিভাবে এটা সম্ভব অথচ বলা হয়েছে। তখন উকবা তার স্ত্রীকে পৃথক করে দিলেন এবং অন্য একজনকে বিয়ে করেন। [বুখারীঃ ৮৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ
الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ؗ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ؗ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ
اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۙ﴿٢٣﴾

স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সংগত হয়েছ তার আগের স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত মেয়ে, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে(১), তবে যদি তাদের সাথে সংগত না হয়ে থাক, তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। আর তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ

সাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে ছিলেন। এমতাবস্থায় আয়েশা শুনতে পেলেন যে, হাফসার ঘরে যাওয়ার জন্য একজন পুরুষ লোক অনুমতি চাচ্ছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! একলোক আপনার পরিবারভুক্ত ঘরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার তো মনে হয় এটা অমুক ব্যক্তি। হাফসার কোন এক দুধ চাচা। তখন আয়েশা বললেন, অমুক যদি জীবিত থাকত- আয়েশার কোন এক দুধ চাচা- তাহলে কি সে আমার কাছে প্রবেশ করতে পারত? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, জন্মগত কারণে যা হারাম হয়, দুধগত কারণেও তা হারাম হয়। [বুখারী: ৫০৯৯; মুসলিম: ১৪৪৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলতেন, জন্মের কারণে যাদেরকে হারাম গণ্য করো দুধ পানের কারণেও তাদেরকে হারাম গণ্য করবে। [মুসলিম: ১৪৪৫] তবে এ দুধপান দু বছরের মধ্যে হয়েছে কি না সে ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন জরুরী; কারণ, হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'দুধ পানের সময়টুকু যেন ঐ সময়েই সংঘটিত হয় যখন সন্তানের দুধ ছাড়া আর কোন খাবার দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ হতো না।' [বুখারী: ৫১০২; মুসলিম: ১৪৫৫]

(১) এখানে অভিভাবকত্ব থাকার কথাটা শর্ত হিসাবে নয়; বরং সাধারণতঃ এ ধরনের মেয়েরা মায়ের সাথেই থাকে আর মা দ্বিতীয় বিবাহের কারণে তার স্বামীর কাছেই থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং এ ধরনের মেয়েদের অভিভাবকত্ব থাকা না থাকা উভয় অবস্থাতেই তাদের বিয়ে করা হারাম। উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি কি আবু সুফিয়ানের মেয়েকে বিয়ে করবেন? রাসূল বললেন যে, তাকে বিয়ে করা আমার জন্য জায়েয হবে না। আমি বললাম, আমি শুনেছি আপনি নাকি বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছেন। রাসূল বললেন, তুমি কি উম্মে সালামার মেয়ের কথা বলছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, যদি সে আমার রাবীবা নাও হত তারপরও আমার জন্য জায়েয হত না। কেননা, আমাকে এবং তার পিতাকে সুআইবাহ্ দুধ পান করিয়েছেন। তোমরা তোমাদের কন্যাদের এবং তোমাদের বোনদের আমার কাছে বিয়ের জন্য পেশ করো না। [বুখারীঃ ৫১০৬]

তোমাদের ঔরসজাত ছেলের স্ত্রী(১) ও দুই বোনকে একত্র করা, আগে যা হয়েছে, হয়েছে(২)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৪. আর নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী(৩) ছাড়া সব

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ

---

(১) অর্থাৎ আপন পুত্রের বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম। যদিও পুত্র শুধু বিবাহই করে-সহবাস না করে।

(২) এখানে বুঝানো হয়েছে যে, পূর্বে এ ধরনের যা কিছু ঘটেছে তা আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু যদি কেউ এরূপ অবস্থায় ইসলামে প্রবেশ করে তবে তাদের মধ্য থেকে দু'জনের একজনকে তালাক দিতে হবে। হাদীসে এসেছে, ফাইরোয আদ্-দাইলামী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললামঃ আমি ঈমান এনেছি অথচ দুই বোন আমার স্ত্রী হিসেবে আছে। রাসূল বললেনঃ তুমি তাদের যে কোন একজনকে তালাক দিয়ে দাও। [ইবন মাজাহ্ঃ ১৯৫১, তিরমিযীঃ ১১২৯] অনুরূপভাবে এ একত্রিতকরণের মাসআলার মধ্যে এমন দু'জনকেও একত্রে বিয়ে করা জায়েয নাই, যাদের একজন পুরুষ সাব্যস্ত হলে অন্যজনের জন্য তাকে বিয়ে করা জায়েয হত না। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মহিলা এবং তার ফুফু অনুরূপভাবে কোন মহিলা ও তার খালাকে একত্রে বিয়ে করা যাবে না। [বুখারীঃ ৫১০৯]

(৩) অধিকারভুক্ত দাসী বলতে ঐ সমস্ত নারীদেরকে বুঝায়, যারা কাফের ছিল। মুসলিমগণ যুদ্ধে তাদের পুরুষদের পরাজিত করে তাদেরকে নিজেদের অধিকারে নিয়ে আসে, তখন তাদেরকে মুসলিমদের জন্য বিয়ে ছাড়াই হালাল করা হয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল যোদ্ধাকে 'আওতাস'-এর দিকে পাঠান। তারা কাফেরদের উপর জয়ী হয়ে তাদের নারীদেরকে নিয়ে আসে। কিন্তু এরা কাফের নারী হওয়ার কারণে মুসলিমগণ তাদেরকে হালাল মনে করছিল না। তখন এই আয়াত নাযিল হয়ে জানিয়ে দেয়া হয় যে, এরা তাদের জন্য হালাল, তবে শর্ত হলো এদের ইদ্দত শেষ হতে হবে। [মুসলিমঃ ১৪৫৬]

যুদ্ধ-বন্দিনী দাসীদের সাথে সংগম করার ব্যাপারে কিছু নিয়মনীতি রয়েছে-

(এক) অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, এটা শুধুমাত্র মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধ হলেই হতে পারে। কোন কারণে যদি মুসলিমদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ হয়, কিংবা মুসলিম দু'টি রাষ্ট্রে যুদ্ধের সূচনা হয়, অথবা মুসলিমদের কোন জাতিগত বা ভাষাগত বা রাজনৈতিক দাঙ্গা হয় সেখানে যে যুদ্ধ হবে সে যুদ্ধের কারণে

اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ
ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ
مُسٰفِحِيْنَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ
اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ
بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٢٤﴾

সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য এগুলো আল্লাহ্‌র বিধান। উল্লেখিত নারীগণ ছাড়া অন্য নারীকে অর্থব্যয়ে বিয়ে করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা সম্ভোগ করেছ তাদের নির্ধারিত মাহ্‌র অর্পণ করবে(১)। মাহ্‌র নির্ধারণের

কাউকে অধিকারভুক্ত দাস-দাসী বানানোর অধিকার ইসলাম কাউকে দেয়নি। যদি কেউ এটা করতে চায় তবে সেটা হবে সম্পূর্ণ অবৈধ ও ব্যভিচার। এ ধরনের লোকদেরকে ব্যভিচারের শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

(দুই) যে সমস্ত মেয়ে বন্দী হয় তাদেরকে ইসলামী আইন অনুযায়ী সরকারের হাতে সোপর্দ করে দিতে হবে। সরকার চাইলে তাদেরকে বিনা শর্তে মুক্ত করে দিতে পারে, মুক্তিপণ গ্রহণ করতে পারে, শত্রুর হাতে যে সমস্ত মুসলিম বন্দী রয়েছে তাদের সাথে এদের বিনিময়ও করতে পারে এবং চাইলে তাদেরকে সৈন্যদের মাঝে বন্টনও করে দিতে পারে। তাই বন্দী করার সাথে সাথেই কোন সৈনিক তাদের সাথে সংগম করার অধিকার লাভ করে না। তাছাড়া কোন ক্রমেই যুদ্ধাবস্থায় এ অধিকার কারও থাকবে না। যদি কেউ যুদ্ধাবস্থায় এ কাজ করে তবে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

(তিন) মেয়েটি গর্ভবতী নয় এতটুকু নিশ্চিত হওয়ার জন্য কমপক্ষে এক মাসিক ঋতুশ্রাব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। গর্ভবতী হলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে সংগম করা যাবে না।

(চার) যে মেয়েকে যার ভাগে দেয়া হবে সে-ই শুধু তাকে ভোগ করতে পারবে; অন্য কেউ নয়।

(পাঁচ) সন্তানের জননী হওয়ার পর এ মেয়েকে আর বিক্রয় করা যাবে না। মালিকের মৃত্যুর পরপরই সে স্বাধীন হয়ে যাবে।

(ছয়) মালিক ইচ্ছে করলে তাকে অন্য কারো কাছে বিয়ে দিতে পারবে। তখন তার খেদমত মালিকের হবে কিন্তু মালিক তার সাথে যৌন সম্পর্ক রাখতে পারবে না।

(সাত) কোন সেনাপতি যদি নিছক সাময়িকভাবে তার সৈন্যদেরকে বন্দিনী মেয়েদের মাধ্যমে নিজেদের যৌন তৃষ্ণা মেটানোর অনুমতি দেয়, তবে তা হবে সম্পূর্ণ অবৈধ। কেননা, এ কাজ ও ব্যভিচারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

(১) অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, এ আয়াতে মহিলাদের মধ্যে যাদের সাথে সম্ভোগ

পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাযী হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই(১)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

২৫. আর তোমাদের মধ্যে কারো মুক্ত ঈমানদার নারী বিয়ের সামর্থ্য(২) না থাকলে তোমরা তোমাদের

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ

হয়েছে তাদেরকে মাহ্‌র পরিশোধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ হিসেবে এ আয়াত পূর্বোক্ত ২১ নং আয়াতের মতই। [আদওয়াউল বায়ান] কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এখানে মুত‘আ বিবাহের কথা বলা হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুত‘আ ও সাময়িক বিয়ের অনুমতি ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে অসংখ্য সহীহ্ হাদীসে এটাকে হারাম ঘোষণা করা হয়। যেমন এক হাদীসে এসেছে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার যুদ্ধের কালে মুত‘আ বিয়ে ও গৃহপালিত গাধার গোস্ত হারাম করেছেন। [বুখারী: ৫১১৫, ৫৫২৩; আরও দেখুন- বুখারীঃ ৪২১৬, মুসলিমঃ ১৪০৬, ১৪০৭] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, এরপর মক্কা বিজয়ের বছর সেটাকে আবার বৈধ করা হয়েছিল। কিন্তু সহীহ হাদীসে এসেছে যে, মক্কা থেকে বের হওয়ার আগেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, এ জাতীয় বিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করে দেয়া হয়েছে। [মুসলিম: ১৪০৬] এ হিসেবে মুত‘আ বিবাহ প্রথমে খায়বারের যুদ্ধে হারাম করা হয়। এরপর মক্কা বিজয়ের সময় হালাল করা হয়, অথবা কোন কোন সাহাবী রাসূলের অগোচরেই না জানা অবস্থায় সেটা করেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের বছর আওতাসের যুদ্ধের সময় তিনদিন কোন কোন সাহাবী সেটা করার পর সেটা চিরতরে কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করে দেয়া হয়। [যাদুল মা‘আদ]

(১) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, মাহ্‌র নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাযী হওয়ার অর্থ হচ্ছে, ধার্যকৃত পূর্ণ মাহ্‌র প্রদান করে স্ত্রীকে তার মাহরের ব্যাপারে পূর্ণ অধিকার প্রদান করা। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) আয়াতের অর্থ এই যে, যার স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার শক্তি-সামর্থ্য নেই কিংবা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই, সে ঈমানদার দাসীদেরকে বিয়ে করতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, যতটা সম্ভব স্বাধীন নারীকেই বিয়ে করা উচিত - দাসীকে বিয়ে না করাই বাঞ্ছনীয়। অগত্যা যদি দাসীকে বিয়ে করতেই হয়, তবে ঈমানদার দাসী খোঁজ করতে হবে। স্বাধীন ইয়াহূদী-নাসারা নারীদেরকে বিয়ে করা যদিও বৈধ, কিন্তু তা থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। বর্তমান যুগে এর গুরুত্ব অত্যাধিক। কেননা, ইয়াহূদী ও নাসারা নারীরা আজকাল সাধারণতঃ স্বয়ং স্বামীকে ও স্বামীর সন্তানদেরকে স্বধর্মে আনার উদ্দেশ্যেই মুসলিমদেরকে বিয়ে করে।

الْمُؤْمِنٰتِ ۭ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ۭ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ
بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ
اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا
مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ
بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ
الْعَذَابِ ۭ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۭ وَاَنْ تَصْبِرُوْا
خَيْرٌ لَّكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٢٥)

অধিকারভুক্ত ঈমানদার দাসী বিয়ে করবে(১); আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তোমরা একে অপরের সমান; কাজেই তোমরা তাদেরকে বিয়ে করবে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে(২) এবং তাদেরকে তাদের মাহ্র ন্যায়সংগতভাবে দেবে। তারা হবে সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নয় ও উপপতি গ্রহণকারিণীও নয়। অতঃপর বিবাহিতা হওয়ার পর যদি তারা ব্যভিচার করে তবে তাদের শাস্তি মুক্ত নারীর অর্ধেক(৩); তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারকে

---

(১) এর দ্বারা বোঝা যায় যে, ঈমানদার নয় এমন দাসী বিয়ে করা জায়েয নেই। অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে, "আর কিতাবী মহিলাদের মধ্যে যারা মুহসিনা" [সূরা আল-মায়িদাহ: ৫] অর্থাৎ তাদেরকে বিয়ে করা হালাল করা হয়েছে। এখানে মুহসিনা বলে কোন কোন মুফাসসিরের মতে স্বাধীনা বোঝানো হয়েছে। সুতরাং কোন অবস্থাতেই কাফের দাসীদেরকে বিয়ে করা জায়েয নেই। যদিও তারা কিতাবী হয়। [তাবারী; আদওয়াউল বায়ান]

(২) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মহিলা অপর মহিলাকে বিয়ে দেবে না। অনুরূপভাবে কোন মহিলা নিজেকেও বিয়ে দেবে না। যে মহিলা নিজেকে নিজে বিয়ে দেয়, সে ব্যভিচারে লিপ্ত। [ইবন মাজাহ্ঃ ১৮৮২] অর্থাৎ বিয়ের ব্যাপারে অবশ্যই অভিভাবকদের অনুমতি নিতে হবে।

(৩) মুক্ত নারীর শাস্তির কথা এখানে বলা হয় নি। অন্যত্র বলে দেয়া হয়েছে যে, 'ব্যভিচারিনী মহিলা ও ব্যভিচারী পুরুষের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর' [সূরা আন-নূর: ২] সে হিসেবে এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, ব্যভিচারিনী দাসীর শাস্তি হবে পঞ্চাশ বেত্রাঘাত। কিন্তু ব্যভিচারী দাসের ব্যাপারটি ভিন্ন কোন আয়াতে আসে নি। তাই ব্যাভিচারিনী দাসীর শাস্তি যেভাবে অর্ধেক হয়েছে সেভাবে ব্যভিচারী দাসের ক্ষেত্রেও তেমনি অর্ধেক শাস্তি হবে; কারণ দাসত্বের দিক থেকে উভয়েই সমান। এটাও এক প্রকার কিয়াস। [আদওয়াউল বায়ান] তবে এটা জানা আবশ্যক যে, দাস-দাসীরা বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক তাদের কোন 'রজম' তথা প্রস্তারাঘাতে মৃত্যুদণ্ড বা দেশান্তর নেই। [তাবারী]

ভয় করে এগুলো তাদের জন্য; আর ধৈর্য ধারণ করা তোমাদের জন্য মঙ্গল(১)। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

পঞ্চম রুকূ’

يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾

২৬. আল্লাহ্ ইচ্ছে করেন তোমাদের কাছে বিশদভাবে বিবৃত করতে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি তোমাদেরকে অবহিত করতে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে(২)। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُوا۟ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾

২৭. আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান। আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও(৩)।

يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ

২৮. আল্লাহ্ তোমাদের ভার কমাতে চান(৪); আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে

---

(১) অর্থাৎ দাসী বিয়ে করার চেয়ে ধৈর্যধারণ করা উত্তম। যাতে করে আল্লাহ্ তা‘আলা যখন তাকে সামর্থ দিবে, তখন যেন স্বাধীনা নারী বিয়ে করতে পারে। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদের মা ও কন্যাদের হারাম হওয়ার ব্যাপারটি বিস্তারিত বর্ণনা করতে চান। আর এটাও জানিয়ে দিতে চান যে, এটা পূর্বে কখনও হালাল ছিল না। সব শরী‘আতেই মা ও মেয়ে হারাম ছিল। [আত-তাফসীরুস সহীহ] অনুরূপভাবে তিনি চান তোমাদেরকে হিদায়াত দিতে বা মিল্লাতে ইবরাহীমীর প্রতি দিকনির্দেশ করতে এবং বর্ণনা আসার পূর্বে তোমাদের কৃত এ জাতীয় গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিতে। [বাগভী]

(৩) আয়াতের অর্থে কাতাদা ও সুদ্দী বলেন, অর্থাৎ যারা ব্যভিচারী বা যারা অন্য মতাদর্শে বিশ্বাসী যেমন, ইয়াহূদী অথবা নাসারা, তারা চায় তোমাদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত করতে, প্রবৃত্তি-পুজারী বানাতে। [তাবারী]

(৪) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদেরকে হাল্কা ও সহজ বিধান দিতে চান। তোমাদের অসুবিধা দূর করার জন্য বিয়ের ব্যাপারে এমন সরল বিধান তিনি দিয়েছেন, যা

ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم
بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ

দুর্বলরূপে(১) ।

২৯. হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি(২) অন্যায়ভাবে(৩) গ্রাস করো না; কিন্তু তোমরা পরস্পর রাযী হয়ে(৪) ব্যবসা করা বৈধ(৫); এবং নিজেদেরকে

সবাই পালন করতে পার। স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার শক্তি না থাকার ক্ষেত্রে বাঁদীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দান করেছেন। [তাবারী] অনুরূপভাবে উভয়পক্ষকে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে মাহ্‌র নির্ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইনসাফ ও সুবিচারের শর্তে একাধিক বিয়ে করার অনুমতিও দিয়েছেন। এসব কিছুই হাল্কা ও সহজ করার স্বার্থেই করা হয়েছে।

(১) অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল। তার মাঝে কাম-বাসনার উপাদানও নিহিত রয়েছে। যদি তাকে নারীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকার আদেশ দেয়া হত, তবে সে আনুগত্য করতে অক্ষম হয়ে পড়ত। তার অক্ষমতা ও দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে নারীদেরকে বিয়ে করার শুধু অনুমতি দেয়া হয়নি; বরং উৎসাহিত করা হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, পরস্পরের মধ্যে অন্যায় পন্থায় একের সম্পদ অন্যের পক্ষে ভোগ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে আরও বুঝা যায় যে, নিজস্ব সম্পদও অন্যায় পথে ব্যয় করা কিংবা অপব্যয় করা নিষিদ্ধ।

(৩) আয়াতে উল্লেখিত 'বাতিল' শব্দটির তরজমা করা হয়েছে 'অন্যায়ভাবে'। আব্দুল্লাহ্‌ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এবং অন্যান্য সাহাবীগণের মতে শরী'আতের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং নাজায়েয সবগুলো পন্থাকেই বাতিল বলা হয়। যেমন, চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ, বিশ্বাসভঙ্গ, ঘুষ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি সকল প্রকার অন্যায় পন্থাই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। [বাহরে মুহীত]

(৪) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিক্রির জন্য সন্তুষ্টি অপরিহার্য। [ইবন মাজাহ্‌ঃ ২১৮৫] এ সন্তুষ্টি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেচাকেনার ক্ষেত্রে আরও কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, যেমন, "বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ে সওদা করার স্থান ছেড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত (সওদা বাতিল করার) সুযোগের অধিকারী থাকবে। তবে– পৃথক হওয়ার পরও এ সুযোগ তাদের জন্য থাকবে–যারা খেয়ার বা সুযোগের অধিকার দেয়ার শর্তে সওদা করবে।" [বুখারী: ২১০৭]

(৫) এর দ্বারা বলে দেয়া হয়েছে যে, যেসব ক্ষেত্রে ব্যবসার নামে সুদ, জুয়া, ধোঁকা-প্রতারণা ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়, সেসব পন্থায় সম্পদ অর্জন করা বৈধ পন্থার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং হারাম ও বাতিল পন্থা। তেমনি যদি

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

হত্যা করো না(১); নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু ।

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

৩০. আর যে কেউ সীমালংঘন করে অন্যায়ভাবে তা করবে, অবশ্যই আমরা তাকে আগুনে পোড়াবো; এসব আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ ।

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

৩১. তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা কবীরা গোনাহ্‌(২) তা থেকে বিরত থাকলে আমরা তোমাদের ছোট পাপগুলো(৩) ক্ষমা করব এবং

স্বাভাবিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকে, তবে সেরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও বাতিল ও হারাম । কাতাদা বলেন, ব্যবসা আল্লাহ্‌র রিযক ও আল্লাহ্‌র হালালকৃত বিষয়, তবে শর্ত হচ্ছে, এটাকে সত্যবাদিতা ও সততার সাথে পরিচালনা করতে হবে । [তাবারী]

(১) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে বলে যে, আমি অন্য কোন ধর্মের উপর । তাহলে সে ঐ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে । বনী আদম যার মালিক নয় এমন মানত গ্রহণযোগ্য নয় । যে কেউ দুনিয়াতে নিজেকে কোন কিছু দিয়ে হত্যা করবে, এটা দিয়েই তাকে কেয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে । যে কোন মুমিনকে লা‘নত করল সে যেন তাকে হত্যা করল । অনুরূপভাবে যে কেউ কোন মুমিনকে কুফরীর অপবাদ দিল, সেও যেন তাকে হত্যা করল । [বুখারীঃ ৬০৪৭, মুসলিমঃ ১৭৬] অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কেউ পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে চিরস্থায়ীভাবে পাহাড় থেকে পড়ার অনুরূপ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে । যে ব্যক্তি বিষ পানে আত্মহত্যা করবে, সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে বিষ পানের আযাব ভোগ করতে থাকবে । আর যে কেউ কোন ধারাল কিছু দিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে তা দ্বারা শাস্তি ভোগ করতে থাকবে । [বুখারীঃ ৫৭৭৮, মুসলিমঃ ১৭৫]

(২) আব্দুল্লাহ্‌ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেনঃ এমন প্রত্যেক গোনাহ্‌ যার পরিণতিতে কুরআন ও হাদীসে জাহান্নামের ভয় দেখানো হয়েছে অথবা আল্লাহ্‌র গযবের কথা এসেছে, অথবা লা‘নতের কথা অথবা আযাবের কথা এসেছে, তাই কবীরা গোনাহ্‌ । কবীরা গোনাহ্‌র সংখ্যা অনেক । কেউ কেউ তা সাতশ’ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন । [তাবারী, ইবন আবী হাতেম]

(৩) উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, পাপ বা গোনাহ দু’রকম । কিছু কবীরা

তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا ﴿۳۲﴾

৩২. আর যা দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার

অর্থাৎ কঠিন ও বড় রকমের পাপ, আর কিছু সগীরা অর্থাৎ হাল্কা ও ছোট পাপ। এ কথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যদি কেউ সাহস করে কবীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তার সগীরা গোনাহ্গুলো নিজেই ক্ষমা করে দেবেন। যাবতীয় ফরয-ওয়াজিবগুলো সম্পাদন করাও কবীরা গোনাহ্ থেকে বাঁচার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ফরয-ওয়াজিবসমূহ ত্যাগ করাও কবীরা গোনাহ্। বস্তুতঃ যে লোক ফরয-ওয়াজিবসমূহ পালনের ব্যাপারে যথাযথ অনুবর্তিতা অবলম্বন করে এবং যাবতীয় কবীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে, আল্লাহ্ স্বয়ং তার সগীরা গোনাহ্সমূহের কাফ্ফারা করে দেবেন। এখানে গোনাহের কাফ্ফারা হওয়ার অর্থ এই যে, কর্তার সৎকর্মসমূহকে সগীরা গোনাহের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেখিয়ে তার হিসাব সমান সমান করে দেয়া হবে। জাহান্নামের পরিবর্তে সে জান্নাত প্রাপ্ত হবে। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, 'কোন লোক যখন সালাত আদায়ের জন্য অযু করে, তখন প্রতিটি অঙ্গ ধৌত হওয়ার সাথে সাথে তার গোনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যায়। মুখমণ্ডল ধুয়ে নিলে চোখ, কান ও নাক প্রভৃতি অঙ্গের পাপসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। কুলি করার সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বার পাপের কাফ্ফারা হয়ে যায়; আর পা ধোয়ার সাথে সাথে ধুয়ে যায় পায়ের পাপসমূহ। তারপর যখন সে মসজিদের দিকে রওয়ানা হয়, তখন প্রতিটি পদক্ষেপে পাপের কাফ্ফারা হতে থাকে।' [নাসায়ীঃ ১/১০৩, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৩৪৯] আলোচ্য আয়াতের দ্বারা এ কথাও বোঝা গেল যে, অযু, সালাত প্রভৃতি সৎকর্মের মাধ্যমে গোনাহ্র কাফ্ফারা হওয়ার ব্যাপারে হাদীসে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ হল সগীরা গোনাহ্। কবীরা গোনাহ্ একমাত্র তাওবা ছাড়া মাফ হয় না। বস্তুতঃ সগীরা গোনাহ্ মাফের শর্ত হল, সাহস ও চেষ্টার মাধ্যমে কবীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে কেউ আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত। সাহাবীগণ কবীরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা, মুসলিম কোন আত্মাকে হত্যা করা এবং যুদ্ধের দিনে ময়দান থেকে পলায়ন করা।' [মুসনাদে আহমাদ ৫/৪১৩]

প্রাপ্য অংশ⁽¹⁾। আর আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

৩৩. পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য আমরা উত্তরাধিকারী করেছি⁽²⁾ এবং

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ؕ
وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

---

(১) কুরআনের কোন কোন আয়াত এবং একাধিক হাদীসের বর্ণনায় সৎকর্মে প্রতিযোগিতা অর্থাৎ অন্যের চাইতে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় অগ্রণী হওয়ার নির্দেশ দেখতে পাওয়া যায়। অনুরূপ অন্যের মধ্যে যে গুণ-গরিমা রয়েছে, তা অর্জন করার জন্য সচেষ্ট হওয়ার প্রতিও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এই যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ঐ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্টের ক্ষেত্রেই অন্যের সাথে প্রতিযেগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন, যেগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ত, যেগুলো চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে মানুষ অর্জন করতে পারে। যেমন, কারো গভীর জ্ঞান বা চারিত্রিক মহত্ত্ব দেখে তার কাছ থেকে তা অর্জন করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করা প্রশংসনীয় কাজ। তাই আয়াতের শেষাংশে সেরূপ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ পুরুষরা যাকিছু সাধনার মাধ্যমে অর্জন করবে তারা তার অংশ পাবে এবং নারীরা যাকিছু অর্জন করবে তার অংশও তারা পাবে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং কর্মে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য লাভ করার চেষ্টা ব্যর্থ হবে না। প্রত্যেকেই তার প্রচেষ্টার ফল অবশ্যই পাবে। উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি অভিযোগের সুরে বলেছিলেনঃ পুরুষরা যুদ্ধ করে, আমরা মহিলারা যুদ্ধ করতে পারি না তদুপরি আমাদের জন্য মীরাসের অর্ধেক। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ৬/৩২২, তিরমিযীঃ ৩০২২] অন্য এক বর্ণনায় আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললঃ হে আল্লাহ্ রাসূল, একজন পুরুষ দুই মহিলার সমান মীরাস পায়, একজন পুরুষের সাক্ষী দুইজন মহিলার সাক্ষীর সমান। আমরা যখন কোন নেক কাজ করব, তখনও কি অর্ধেক সওয়াব হবে? তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। যাতে বলা হয়েছে যে, এটা আমার ইনসাফ এবং এটা আমিই করেছি। [আল-আহাদীসুল মুখতারাহ্ঃ ১০/১১৬-১১৭, নং- ১১৫]

(২) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ মুহাজেররা যখন মদীনায় হিজরত করে আসত, তখন আনসারদের নিকটাত্মীয়দের বাদ দিয়ে যাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন মুহাজেররা তাদের ওয়ারিস হত। তারপর যখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়, তখন তা রহিত হয়ে যায়। [বুখারীঃ ২২৯২, ৪৫৮০, ৬৭৪৭]

كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿٣٣﴾

যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদেরকে তাদের অংশ দেবে(১)। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বকিছুর সম্যক দ্রষ্টা।

ষষ্ঠ রুকূ'

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ
بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ
وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ

৩৪. পুরুষরা নারীদের কর্তা(২), কারণ আল্লাহ্ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এজন্যে যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে(৩)। কাজেই পূণ্যশীলা স্ত্রীরা

---

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যখন 'আর যাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তাদেরকে তাদের অংশ দেবে' এ আয়াত নাযিল হয়, তখন কেউ কেউ অপর কারও সাথে বংশীয় কোন সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও চুক্তিবদ্ধ হতো, এর ফলে একে অপরের ওয়ারিশ হতো। তারপর যখন আল্লাহ্‌র বাণী 'আর আত্মীয়রা আল্লাহ্‌র বিধানে একে অন্যের চেয়ে বেশী হকদার।' [সূরা আল-আনফাল:৭৫; আল-আহযাব:৬] এ আয়াত নাযিল হয়, তখন তাও রহিত হয়ে যায়। [মুস্তাদরাকে হাকিম ৪/৩৪৬; তাবারী]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ ব্যতীত যদি অন্য কাউকে আমি সিজ্‌দা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে তার স্বামীকে সিজ্‌দা করার অনুমতি দিতাম। [তিরমিযীঃ ১১৫৯]

(৩) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের বক্তব্য অনুসারে পুরুষ ও নারীদের অধিকার পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ, বরং পুরুষের তুলনায় নারীদের দুর্বলতার কারণে তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ নারীরা বল প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে পারে না। কিন্তু তথাপি এই সমতার অর্থ এই নয় যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে মর্যাদার কোন পার্থক্য থাকবে না; বরং দু'টি ন্যায়সঙ্গত ও তাৎপর্যের প্রেক্ষিতেই পুরুষদেরকে নারীদের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে। **প্রথমতঃ** পুরুষকে তার জ্ঞানৈশ্বর্য ও পরিপূর্ণ কর্মক্ষমতার কারণে নারী জাতির উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে, যা অর্জন করা নারী জাতির পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। দৈবাৎ কিংবা ব্যক্তিবিশেষের কথা স্বতন্ত্র। **দ্বিতীয়তঃ** নারীর যাবতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা পুরুষরা নিজের উপার্জন কিংবা স্বীয় সম্পদের দ্বারা বিধান করে থাকে। মোটকথা: ইসলাম পুরুষকে নারীর নেতা বানিয়েছে। নারীর উপর কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ্ তাকে তার স্বামীর যা আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন তার আনুগত্য করা। আর সে আনুগত্য হচ্ছে, সে স্বামীর পরিবারের প্রতি দয়াবান থাকবে, স্বামীর সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। স্বামীর পক্ষ থেকে খরচ ও কষ্ট করার কারণে আল্লাহ্ স্বামীকে স্ত্রীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। [তাবারী]

فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

অনুগতা(১) এবং লোকচক্ষুর আড়ালে আল্লাহ্‌র হেফাযতে তারা হেফাযত করে(২)। আর স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশংকা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদেরকে প্রহার কর(৩)। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করো না(৪)। নিশ্চয় আল্লাহ্

---

(১) আরবী ﴿قٰنِتٰتٌ﴾ শব্দটির মূল হল قَانِتٌ। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, কুরআনের যেখানেই এ শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, সেখানেই অনুগত থাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। [তাবারী]

(২) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সবচেয়ে উত্তম নারী হল ঐ স্ত্রী যার দিকে তুমি তাকালে তোমাকে সে খুশী করে। তাকে নির্দেশ দিলে আনুগত্য করে। তুমি তার থেকে অনুপস্থিত থাকলে সে তার নিজেকে এবং তোমার সম্পদকে হেফাযত করে। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/২৫১, ৪৩২, ৪৩৮, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/১৬১]

(৩) সেসব স্ত্রীলোক, যারা স্বামীদের আনুগত্য করে না কিংবা যারা এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। আল্লাহ্ তা‘আলা সংশোধনের জন্য পুরুষদেরকে যথাক্রমে তিনটি উপায় বাতলে দিয়েছেন। অর্থাৎ স্ত্রীদের পক্ষ থেকে যদি নাফরমানী সংঘটিত হয় কিংবা এমন আশংকা দেখা দেয়, তবে প্রথম পর্যায়ে তাদের সংশোধন হল যে, নরমভাবে তাদের বোঝাবে। যদি তাতেও বিরত না হয়, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের বিছানা নিজের থেকে পৃথক করে দেবে। যাতে এই পৃথকতার দরুন সে স্বামীর অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে পারে। তারপর যদি তাতেও সংশোধন না হয়, তবে মৃদুভাবে মারবে, তিরস্কার করবে। আর তার সীমা হল এই যে, শরীরে যেন সে মারধরের প্রতিক্রিয়া কিংবা যখম না হয়। কিন্তু এই পর্যায়ের শাস্তি দানকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করেননি, বরং তিনি বলেছেনঃ ‘ভাল লোক এমন করে না’। [ইবন হিব্বানঃ ৯/৪৯৯, নং- ৪১৮৯, আবু দাউদঃ ২১৪৬, ইবন মাজাহ্ঃ ১৯৮৫] যাইহোক, এ সাধারণ মারধরের মাধ্যমেই যদি সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, তবুও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেল।

(৪) পূর্বের আয়াতাংশে যেমন স্ত্রীদের সংশোধনকল্পে পুরুষদেরকে তিনটি অধিকার দান করা হয়েছে, তেমনিভাবে আয়াতের শেষাংশে একথাও বলা হয়েছে যে, যদি এ তিনটি ব্যবস্থার ফলে তারা তোমাদের কথা মানতে আরম্ভ করে, তবে তোমরাও আর বাড়াবাড়ি করো না এবং দোষ খোঁজাখুঁজি করো না, বরং কিছু সহনশীলতা অবলম্বন

শ্রেষ্ঠ, মহান।

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾

৩৫. আর তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা করলে তোমরা স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত কর; তারা উভয়ে নিস্পত্তি চাইলে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত(১)।

কর। আর একথা খুব ভাল করে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নারীদের উপর তেমন কোন উচ্চ মর্যাদা দান করেননি। আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব তোমাদের উপরও বিদ্যমান রয়েছে, তোমরা কোন রকম বাড়াবাড়ি করলে তার শাস্তি তোমাদেরকেও ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ তোমরাও সহনশীলতার আশ্রয় নাও; সাধারণ কথায় কথায় দোষারোপের পন্থা খুঁজে বেড়িয়ো না। আর জেনে রেখো আল্লাহ্র কুদরত ও ক্ষমতা সবার উপরেই পরিব্যাপ্ত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার স্ত্রীকে চাকর-বাকরদের মত না মারে, পরে সে দিনের শেষে তার সাথে আবার সহবাস করল। [বুখারীঃ ৫২০৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমাদের কারো উপর তার স্ত্রীর কি হক আছে? রাসূল বললেনঃ তুমি খেতে পেলে তাকেও খেতে দেবে, তুমি পরিধান করলে তাকেও পরিধেয় বস্ত্র দেবে, তার চেহারায় মারবে না এবং তাকে কুৎসিৎও বানাবে না, তাকে পরিত্যাগ করলেও ঘরের মধ্যেই রাখবে। [আবু দাউদঃ ২১৪২]

(১) উল্লেখিত ব্যবস্থাটি ছিল এ কারণে, যাতে ঘরের ব্যাপার ঘরেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অনেক সময় মনোমালিন্য বা বিবাদ দীর্ঘায়িতও হয়ে যায়। তা স্ত্রীর স্বভাবের তিক্ততা ও অবাধ্যতা কিংবা পুরুষের পক্ষ থেকে অহেতুক কড়াকড়ি প্রভৃতি যে কোন কারণেই হোক এমতাবস্থায় ঘরের বিষয় আর ঘরে সীমিত থাকে না; বাইরে নিয়ে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের বিবাদ-বিসংবাদের দরজা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সমসাময়িক শাসকবর্গ, উভয় পক্ষের সমর্থক ও পক্ষাবলম্বীদের এবং মুসলিম সংস্থাকে সম্বোধন করে এমন এক পবিত্র পন্থা বাতলে দিয়েছেন, তা হল এই যে, সরকার, উভয় পক্ষের মুরুব্বী-অভিভাবক অথবা মুসলিমদের কোন শক্তিশালী সংস্থা তাদের (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে আপোষ করিয়ে দেয়ার জন্য দু'জন সালিস নির্ধারণ করে দেবেন। একজন স্বামীর পরিবার থেকে এবং একজন স্ত্রীর পরিবার থেকে। এতদুভয় ক্ষেত্রে সালিস অর্থে حكم (হাকাম) শব্দ প্রয়োগ করে কুরআন নির্বাচিত সালিসদ্বয়ের প্রয়োজনীয় গুণ-বৈশিষ্টের বিষয়টিও

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى

৩৬. আর তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর ও কোন কিছুকে তাঁর শরীক করো না(১); এবং পিতা-মাতা(২), আত্মীয়-

---

নির্ধারণ করে দিয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, এতদুভয়ের মধ্যেই বিবাদ মীমাংসা করার গুণ থাকতে হবে। বলাবাহুল্য, এ গুণটি সে ব্যক্তির মধ্যেই থাকতে পারে, যিনি বিজ্ঞও হবেন এবং তৎসঙ্গে বিশ্বস্ত ও দ্বীনদারও হবেন।

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ‘ইবাদাত কর এবং ‘ইবাদাতের বেলায় তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করো না। মু‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে তার বাহনে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, তুমি কি জান, বান্দার উপর আল্লাহ্‌র কি হক? আমি বললামঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক হল, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা। তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো অনেক পথ চলার পর আবার বললেনঃ হে মু‘আয ইবন জাবাল! তুমি কি জান, বান্দা যদি এ কাজটি করে তাহলে আল্লাহ্‌র উপর বান্দার কি হক রয়েছে? আমি বললামঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্‌র উপর বান্দার হক হল, তাদেরকে শাস্তি না দেয়া। [বুখারীঃ ৬৫০০]

(২) আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাওহীদের পর সমস্ত আপনজন-আত্মীয় ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পিতা-মাতার অধিকার সর্বাগ্রে। আল্লাহ্ তা‘আলা স্বীয় ‘ইবাদাত বন্দেগী ও হকসমূহের পর পরই পিতা-মাতার হক সম্পর্কিত বিবরণ দানের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত নেয়ামত ও অনুগ্রহ একান্তই আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে, কিন্তু বাহ্যিক উপকরণের দিক দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আল্লাহ্‌র পরে মানুষের প্রতি সর্বাধিক ইহ্‌সান বা অনুগ্রহ থাকে পিতা-মাতার। সাধারণ উপকরণসমূহের মাঝে মানুষের অস্তিত্বের পিছনে পিতা-মাতাই বাহ্যিক কারণ। তাছাড়া জন্ম থেকে যৌবন প্রাপ্তি পর্যন্ত যে সমস্ত কঠিন ও বন্ধুর পথ ও স্তর রয়েছে, পিতা-মাতাই তাকে সেগুলোতে সাহায্য করেন এবং তার প্রতিপালন ও পরিবর্ধনের জামানতদার হয়ে থাকেন। সে জন্যই আল্লাহ্ তা‘আলা অন্যান্য জায়গায়ও পিতা-মাতার হকসমূহকে তাঁর ‘ইবাদাত ও আনুগত্যের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ “আমার এবং তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর”। [সূরা লুকমান: ১৪] রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহে যেমন পিতা-মাতার আনুগত্য এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের তাকিদ রয়েছে, তেমনিভাবে তার সীমাহীন ফযীলত, মর্তবা ও সওয়াবের কথাও উল্লেখ রয়েছে। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ্ তা‘আলার সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে।” [তিরমিযী: ১৮৯৯]

وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ

স্বজন(১), ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত(২), নিকট প্রতিবেশী(৩), দুর-প্রতিবেশী(৪),

---

(১) এখানে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করার তাকিদ দেয়া হয়েছে। কুরআনুল কারীমের প্রসিদ্ধ এক আয়াতে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়শঃই বিভিন্ন ভাষণের পর তেলাওয়াত করতেন। তা হলো, “আল্লাহ্ সবার সাথে ন্যায় ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং নির্দেশ দিচ্ছেন আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করার জন্য”। [সূরা আন-নাহল:৯০] এতে সামর্থ্যানুযায়ী আত্মীয়-আপনজনদের কায়িক ও আর্থিক সেবা-যত্ন করা, তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা এবং তাদের খবরা-খবর নেয়াও অন্তর্ভুক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সদকার মাল সাধারণ গরীব-মিসকীনকে দান করলে তাতে তো শুধু সদকার সওয়াবই পাওয়া যায়, অথচ তা যদি নিজের রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-আপনজনকে দান করা হয়, তাহলে তাতে দু’টি সওয়াব পাওয়া যায়। একটি হল সদকার সওয়াব এবং আরেকটি হল সেলায়ে-রেহ্মীর সওয়াব। [মুসনাদে আহমাদ ৪/২১৪, নাসায়ী: ২৫৮২] অর্থাৎ আত্মীয়তার হক আদায় করার সওয়াব।

(২) অর্থাৎ লাওয়ারিশ তথা অনাথ শিশু এবং অসহায় মানুষের সাহায্য-সহযোগিতাও এমনি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিবেচনা করবে, যেমন আত্মীয়-আপনজনদের বেলায় করে থাক।

(৩) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আবু যর, যখন তরকারী রান্না করবে তখন তাতে বেশী পরিমাণে পানি দিও এবং এর দ্বারা তোমার পড়শীর খোঁজ-খবর নিও। [মুসলিমঃ ২৬২৫] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে সে যেন তার পড়শীর সম্মান করে, তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান আনে সে যেন তার মেহমানের পুরস্কার দিয়ে তাকে সম্মানিত করে। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, মেহমানের পুরস্কার কি? তিনি বললেন, একদিন ও রাত্রি। আর মেহমান তিন দিন এর পরের যা সময় তাতে ব্যয় করা সদকাস্বরূপ। তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্ ও শেষ দিনে উপর ঈমান আনে সে যেন ভাল বলে অথবা চুপ থাকে। [বুখারী: ৬০১৯] অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে উত্তম সংগী হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সংগীগণ। আর আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে উত্তম পড়শী হচ্ছেন ঐ পড়শী, যে তার পড়শীর জন্য উত্তম। [তিরমিযী: ১৯৪৪]

(৪) এ আয়াতে দু'রকমের প্রতিবেশীর কথা বলা হয়েছে। এ উভয় প্রকার প্রতিবেশীর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, جَارِ ذِى الْقُرْبٰى বলতে সেসব প্রতিবেশীকে বোঝায়, যারা প্রতিবেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়ও বটে। এভাবে এতে দু'টি হক সমন্বিত হয়ে যায়। আর ﴿وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ বলতে শুধু সে প্রতিবেশীকে বোঝায় যার সাথে আত্মীয়তার

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ

সঙ্গী-সাথী(১), মুসাফির(২) ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের(৩) প্রতি

সম্পর্ক নেই। আর সে জন্যই তার উল্লেখ করা হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ে। [তাবারী] কোন কোন মনীষী বলেছেন, 'জারে-যিলকোরবা' এমন প্রতিবেশীকে বলা হয়, যে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং মুসলিম। আর 'জারে-জুনুব' বলা হয় অমুসলিম প্রতিবেশীকে। কুরআনে ব্যবহৃত শব্দে অবশ্য এ সমুদয় সম্ভাব্যতাই বিদ্যমান। অবশ্য প্রতিবেশী হওয়া ছাড়াও যার অন্যান্য হক রয়েছে, অন্যান্য প্রতিবেশীদের তুলনায় তাকে মর্যাদাগত অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(১) যদিও এর শাব্দিক অর্থ হল সহকর্মী। এতে সেসব সফর সঙ্গীরাও অন্তর্ভুক্ত যারা রেল, জাহাজ, বাস, মোটর প্রভৃতিতে পাশাপাশি বসে ভ্রমণ করে এবং সে সমস্ত লোকও অন্তর্ভুক্ত যারা কোন সাধারণ বা বিশেষ বৈঠক বা অধিবেশনে আপনার সাথে উপবেশন করে থাকে। ইসলামী শরী'আত নিকটবর্তী ও দূরবর্তী স্থায়ী প্রতিবেশীদের অধিকার সংরক্ষণকে যেমন ওয়াজিব করে দিয়েছে, তেমনিভাবে সে ব্যক্তির সাহচর্যের অধিকার বা হককেও অপরিহার্য করে দিয়েছে, যে সামান্য সময়ের জন্য হলেও কোন মজলিস, বৈঠক অথবা সফরের সময় আপনার সমপর্যায়ে উপবেশন করে। তাদের মধ্যে মুসলিম, অমুসলিম, আত্মীয়, অনাত্মীয় সবাই সমান - সবার সাথেই সদ্ব্যবহার করার হেদায়াত করা হয়েছে। এর সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে এই যে, আপনার কোন কথায় বা কাজে যেন সে কোন রকম কষ্ট না পায়। এমন কোন কথা বলবেন না, যাতে সে মর্মাহত হতে পারে। এমন কোন আচরণ করবেন না, যাতে তার কষ্ট হতে পারে। যেমন, ধুমপান করে তার দিকে ধোঁয়া ছাড়া, পান খেয়ে তার দিকে পিক ফেলা এবং এমনভাবে বসা যাতে তার বসার জায়গা সংকুচিত হয়ে যায় প্রভৃতি। যানবাহনে অন্য কোন যাত্রী পাশে বসতে গেলে এ কথা ভাবা উচিত যে, এখানে তার ততটুকুই অধিকার রয়েছে যতটা রয়েছে আমার। কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, এমন প্রতিটি লোকই 'সাহেবে-বিল-জাম্ব'-এর অন্তর্ভুক্ত যে কোন কাজে, কোন পেশায় বা কোন বিষয়ে আপনার সাথে জড়িত বা আপনার অংশীদার; তা শিল্প-শ্রমেই হোক অথবা অফিস-আদালতের চাকরিতেই হোক অথবা কোন সফরে বা স্থায়ী বসবাসেই হোক। [রুহুল মা'আনী]

(২) আয়াতে এমন লোককে বোঝানো হয়েছে যে সফরের অবস্থায় আপনার নিকট এসে উপস্থিত হয় কিংবা আপনার মেহমান হয়ে যায়। যেহেতু এই অজানা-অচেনা লোকটির কোন আত্মীয় বা সম্পর্কীয় লোক এখানে উপস্থিত থাকে না, সেহেতু কুরআন ইসলামী তথা মানবীয় সম্পর্কের প্রেক্ষিতে তার হকও আপনার উপর অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছে। তা হল, সামর্থ্য ও সাধ্যানুযায়ী তার সাথে সদ্ব্যবহার করা।

(৩) এতে অধিকারভুক্ত দাস-দাসীকে বোঝানো হয়েছে। তাদের ব্যাপারেও এ হক সাব্যস্ত ও অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে যে, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। সাধ্যানুযায়ী তাদের খাওয়া পরার ব্যাপারে কার্পণ্য করবে না। তাছাড়া তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত

اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ﴿٣٦﴾

সদ্ব্যবহার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে(১)।

কোন কাজ তাদের দ্বারা করাবে না। এখানে আয়াতের বাক্যগুলো যদিও সরাসরিভাবে অধিকারভুক্ত দাস-দাসীকেই বোঝাচ্ছে, কিন্তু কারণ-উপকরণের সামঞ্জস্য এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন বক্তব্যের ভিত্তিতে আলোচ্য নির্দেশ ও বিধি-বিধান দাস-দাসী, চাকর-চাকরানী ও অন্যান্য কর্মচারীর ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। তাদের হকও একই রকম। নির্ধারিত বেতন-ভাতা, খানাপিনা প্রভৃতির ব্যাপারে কার্পণ্য বা বিলম্ব করা যাবে না এবং তাদের উপর সাধ্যাতীত কোন কাজও চাপানো যাবে না। যদি শরী'আত মত তাদেরকে পরিচালনা করা হয় তবে তাদের যাবতীয় খরচও সদকার অন্তর্ভুক্ত। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তুমি নিজে যা খাও তা তোমার জন্য সদকা এবং যা তোমার ছেলেকে খাওয়াও তাও তোমার জন্য সদকা, যা তোমার স্ত্রীকে খাওয়াও তাও তোমার জন্য সদকা। অনুরূপভাবে যা তোমার খাদেমকে খাওয়াও সেটাও তোমার জন্য সদকা হিসাবে গণ্য হবে। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/১৩১] অপর বর্ণনায় এসেছে, মা'রূর ইবন সা'য়ীদ বলেন, আমি আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুর গায়ে একটি চাদর দেখলাম, অনুরূপ আরেকটি চাদর তার দাসের গায়ে দেখলাম। এ ব্যাপারে আমরা আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, একদিন এক লোককে গালি দিয়েছিলাম। সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে গালি দিলে রাসূল আমাকে বললেন, তুমি কি তাকে তার মায়ের ব্যাপার উল্লেখ করে অপমান করলে? তারপর তিনি বললেন, "এরা তোমাদের ভাই, তোমাদের অনুগামী। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের কর্তৃত্বাধীন করেছেন। অতএব যার কোন ভাই তার কর্তৃত্বাধীন থাকে, তবে সে যা খায় তা থেকে যেন তাকে খাওয়ায়, যা পরিধান করে তা থেকে যেন তাকে পরিধান করায়। তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কোন দায়িত্ব তাদেরকে দিবে না, যদি সাধ্যের অতিরিক্ত কোন দায়িত্ব দাও তবে তাদেরকে সাহায্য কর।" [বুখারী: ২৫৪৫; মুসলিম: ১৬৬২]

(১) আল্লাহ্ এমন লোককে পছন্দ করেন না, যে দাম্ভিক এবং নিজেকে অন্যের চাইতে বড় প্রতিপন্ন করে। আয়াতের এই শেষ বাক্যটি পূর্ববর্তী সমস্ত বক্তব্যের উপসংহার। কারণ, পূর্ববর্তী আটটি পর্যায়ে যে সমস্ত লোকের হক সম্পর্কে তাকীদ করা হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে সে সমস্ত লোকই শৈথিল্য প্রদর্শন করে যাদের মন-মানসিকতায় আত্মগর্ব, অহমিকা, তাকাব্বুর ও দাম্ভিকতা বিদ্যমান। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে ওসীয়ত করে বলেছেনঃ 'কাউকে গালি দিও না। সাহাবী বললেনঃ এরপর আমি কোন স্বাধীন, দাস, উট বা ছাগল কাউকেই গালি দেইনি। তিনি আরো বললেনঃ সামান্য কোন নেক কাজকেও হেয় করে দেখবে না যদিও তোমার কোন ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে কথা বলা হোক। আর তোমার কাপড়কে টাখনুর অর্ধেক পর্যন্ত উঠাবে, যদি তা করতে না চাও তবে দুই গিরা পর্যন্ত নামাতে পার।

৩৭. যারা কৃপণতা করে(১) এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তা গোপন করে। আর আমরা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি(২)।

ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٣٧﴾

কাপড়কে 'ইসবাল' বা গিরার নীচে পরা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ কর। কেননা, এটাই অহংকারের চিহ্ন। আল্লাহ্ তা'আলা অহংকারীকে পছন্দ করেন না। যদি কোন লোক তোমাকে গালি দেয় অথবা তোমার কোন ত্রুটি জানতে পেরে তা নিয়ে উপহাস করে, তুমি তার সেরকম কিছু জেনেও তাকে উপহাস করো না। কারণ, এর প্রতিফল তাকেই ভোগ করতে হবে। [আবু দাউদঃ ৪০৮৪, তিরমিযীঃ ২৭২২]

(১) এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত লোক দাম্ভিক তারা ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রেও কার্পণ্য করে। নিজের দায়িত্ব উপলব্ধি করে না এবং অন্যান্য লোককেও নিজের অশোভন কথা এবং কার্যকলাপের মাধ্যমে এ ধরনের মন্দ অভ্যাস অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহিত করে। আয়াতে যে بخل শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, প্রচলিত অর্থে এর প্রয়োগ হয়ে থাকে সাধারণতঃ অর্থ সম্পদ সংক্রান্ত অধিকার বা হক আদায়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে। কিন্তু আয়াতের শানে-নুযুল পর্যালোচনা করতে গেলে বোঝা যায়, এখানে بخل বা কার্পণ্য শব্দটি সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে অর্থ-সম্পদ, জ্ঞান ও অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্পণ্যই অন্তর্ভুক্ত। দান-খয়রাতের ফযীলত এবং কার্পণ্যে ক্ষতি সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'প্রতিদিন ভোর বেলায় দু'জন ফিরিশ্তা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ্! সৎপথে ব্যয়কারীদেরকে শুভ প্রতিদান দান করুন। আর অন্যজন বলেন, হে আল্লাহ্! কৃপণকে ধন-সম্পদের দিক দিয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন করে দিন।' [বুখারীঃ ১৪৪২] অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক, কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে এ কৃপণতাই ধ্বংস করেছে। তাদেরকে তাদের কার্পণ্য নির্দেশ দিয়েছে কৃপণতা করার, ফলে তারা কৃপণতা করেছে, অনুরূপভাবে তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে ফলে তারা তা ছিন্ন করেছে এবং তাদেরকে অশ্লীলতার নির্দেশ দিয়েছে ফলে তারা অশ্লীল কাজ করেছে। [আবু দাউদঃ ১৬৯৮]

(২) অর্থাৎ তারা কাফির। আর আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। তাদের শাস্তি অবধারিত। মুজাহিদ বলেন, এ আয়াত এবং এর পরবর্তী আয়াতগুলোয় ইয়াহূদীদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। কারণ তারা এ কাজগুলো করত। [তাবারী] এরপর যাদের মধ্যেই উপর্যুক্ত খারাপ গুণাগুণ পাওয়া যাবে, তারাও আল্লাহ্‌র কাছে মন্দ বলে বিবেচিত হবে।

৩৮. আর যারা মানুষকে দেখাবার জন্য(১) তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে না। আর শয়তান কারো সঙ্গী হলে সে সঙ্গী কত মন্দ(২)!

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾

৩৯. তারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান আনলে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করলে তাদের কি ক্ষতি হত? আর আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾

৪০. নিশ্চয় আল্লাহ্ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না(৩)। আর কোন পূণ্য কাজ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً

---

(১) এর দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও কার্পণ্য প্রদর্শন করা যেমন দূষণীয়, তেমনিভাবে লোক দেখানোর জন্য এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে ব্যয় করাও নিতান্ত মন্দ কাজ। যারা একান্তভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে, তাদের আমল আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হয় না। হাদীসে এমন কাজকে শির্ক বলেও অভিহিত করা হয়েছে। শাদ্দাদ ইবন আওস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 'যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করল সে শির্ক করল। যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সিয়াম পালন করল সে শির্ক করল এবং যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান-সদকা করল সে শির্ক করল'। [মুসনাদে ত্বায়ালেসীঃ ১১২০, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ৪/৩৬৫]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ভালবাসেন না। অথবা যারা উপর্যুক্ত কাজগুলো করবে, শয়তান তাদের সাথী হবে। আর যারা আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা পায় না তারা শয়তানের সঙ্গী হবে এটাই স্বাভাবিক। যারা শয়তানের সঙ্গী হবে তারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট সংগীই পেল।

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কারও সৎকর্মের সওয়াব এবং অশুভ প্রতিদানের বেলায় বিন্দু-বিসর্গও অন্যায় ও যুলুম করেন না। বরং নিজের পক্ষ থেকে এতে অধিকতর বৃদ্ধি করে দেন এবং আখেরাতে এগুলোকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে তার সওয়াব দান করবেন এবং নিজের পক্ষ থেকেও দেবেন মহান দান। আল্লাহ্ তা'আলা হলেন মহাদাতা। তিনি তাঁর অসীম রহমতে (সৎ কাজের বিনিময়) এমনভাবে বাড়িয়ে দেন, যা কোন হিসাব বা সীমা-পরিসীমায় আসে না। প্রতিটি ভাল কাজ মীযানে পরিমাপ হবে। আল্লাহ্ বলেন, "আর কেয়ামতের দিনে আমরা ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন

يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا (٤٠)

হলে আল্লাহ্ সেটাকে বহুগুণ বর্ধিত করেন⁽১⁾ এবং আল্লাহ্ তাঁর কাছ থেকে মহাপুরস্কার প্রদান করেন⁽২⁾।

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ

৪১. অতঃপর যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব⁽৩⁾

করব, সুতরাং কারো প্রতি কোন যুলুম করা হবে না” [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ৪৭] অনুরূপভাবে লুকমানের ওসিয়ত বর্ণনায় আল্লাহ্ বলেন, “হে প্রিয় বৎস! নিশ্চয় তা (পাপ-পুণ্য) যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা থাকে শিলাগর্ভে অথবা আসমানসমূহে কিংবা যমীনে, আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন” [সূরা লুকমানঃ ১৬] অন্য সূরায় আল্লাহ্ বলেন, “সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখান যায়, কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখবে, আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকাজ করলে সে তাও দেখবে” [সূরা আয-যালযালাহ:৬-৮]

(১) এ আয়াতে কতগুণ বর্ধিত হবে, তার সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণ করে বলা হয় নি। পক্ষান্তরে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, সর্বনিম্ন বর্ধিতের পরিমাণ হচ্ছে, দশগুণ। আল্লাহ্ বলেন, ‘যে কেউ কোন সৎকাজ করল, তার জন্য রইল সেটার অনুরূপ দশগুণ’ [সূরা আল-আন‘আমঃ ১৬০] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বহুগুণ বর্ধিত হওয়ার ব্যাপারে আরও বলেছেন যে, তা কখনও কখনও সত্তর গুণেরও বেশী হয়ে যায়। আল্লাহ্ বলেন, ‘যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশ শস্যদানা। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন।’ [সূরা আল-বাকারাহঃ ২৬১] এর অর্থ হচ্ছে, সাতশ গুণ হওয়াতেই এ বর্ধিতকরণের পরিমাণ সীমাবদ্ধ নয়, বরং কখনও কখনও আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তার থেকে বেশী বৃদ্ধি করে থাকেন। [আদওয়াউল বায়ান] মোটকথাঃ আল্লাহ্ তা‘আলার দরবার থেকে যে কি মহাদান হতে পারে, তা কোন মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তাই আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে চলে যতটুকু সম্ভব সৎ কর্মের মাধ্যমে তাঁর রহমতের অধিকারী হওয়ার প্রচেষ্টা চালানোই হবে মুমিন জীবনের প্রধান কাজ।

(২) কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা‘আলা কারও কারও জন্য সামান্য আমলকেও নিজের পক্ষ থেকে বাড়িয়ে তার নাজাতের অসীলা বানিয়ে দিবেন। শাফা‘আতের বিখ্যাত হাদীসে এসেছে, “অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা বলবেন, তোমরা যাও এবং যার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান আছে তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে নাও। তখন তারা যাদের সম্পর্কে জানতে পারবে তাদেরকে বের করে আনবেন।” বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু উপরোক্ত আয়াতটি পড়ার জন্য বললেন। [বুখারীঃ ৭৪৩৯]

(৩) এখানে আখেরাতের ময়দানের দৃশ্যকে সামনে উপস্থিত করার প্রতি লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে। এতে মক্কাবাসী কাফেরদের ভীতি প্রদর্শনও উদ্দেশ্য বটে। তাদের

عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ﴿٤١﴾

এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব তখন কি অবস্থা হবে(১)?

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ
لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ
حَدِيْثًا ﴿٤٢﴾

৪২. যারা কুফরী করেছে এবং রাসূলের অবাধ্য হয়েছে তারা সেদিন কামনা করবে, যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেত(২)! আর তারা আল্লাহ্ হতে কোন

কি অবস্থা হবে, যখন হাশরের ময়দানে প্রত্যেক উম্মতের নবীগণকে নিজ নিজ উম্মতের পাপ-পুণ্য ও সৎ-অসৎ আমলের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করা হবে এবং যখন আপনিও নিজের উম্মতের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। আর বিশেষ করে সেই কাফের-মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র আদালতে সাক্ষ্য দান করবেন যে, তারা প্রকাশ্য সব মু'জিযা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও মিথ্যারোপ করেছে এবং আল্লাহ্‌র তাওহীদ ও আমার রেসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করে নি। হাদীসে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে লক্ষ্য করে বলেছেন, আমাকে কুরআন শোনাও। আব্দুল্লাহ্ বললেন, আপনি কি আমার কাছ থেকে শুনতে চান, অথচ কুরআন আপনার উপরই নাযিল হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ পড়। আব্দুল্লাহ্ বললেন, অতঃপর আমি সূরা আন্-নিসা পড়তে আরম্ভ করলাম। তারপর এ আয়াত অর্থাৎ ﴿فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ﴾ পর্যন্ত পৌঁছার পর তিনি বললেন, এবার থাম। তারপর যখন আমি তার দিকে চোখ তুলে তাকালাম, দেখলাম, তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। [মুসলিমঃ ৮০০]

(১) কোন কোন মনীষী বলেছেন, هٰـؤُلاء এর দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে উপস্থিত কাফের মুনাফেকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবার অনেকের মতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত গোটা উম্মতের প্রতিই এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যাই হোক, এতে বোঝা গেল যে, বিগত উম্মতসমূহের নবী-রাসূলগণ নিজ নিজ উম্মতের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হবেন এবং স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও স্বীয় উম্মতের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দান করবেন। কুরআনুল কারীমের এই বর্ণনারীতির দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না, যিনি স্বীয় উম্মতের উপর সাক্ষ্য দান করতে পারেন। অন্যথায় কুরআনুল কারীমে তাঁর (অর্থাৎ সে নবীর এবং তাঁর সাক্ষ্যদানের) বিষয়ও উল্লেখ থাকত। এ হিসেবে উক্ত আয়াতটি খতমে নবুওয়াতেরও একটি প্রমাণ।

(২) এ আয়াতে হাশরের মাঠে কাফেরদের দূরাবস্থার বিবরণ দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এরা কিয়ামতের দিন কামনা করবে যে, হায়! আমরা যদি ভূমির সাথে মিশে যেতাম, ভূমি যদি দ্বিধা হয়ে যেত আর আমরা তাতে ঢুকে গিয়ে মাটি হয়ে যেতাম এবং এখানকার জিজ্ঞাসাবাদ ও হিসাব-নিকাশ থেকে যদি অব্যাহতি লাভ করতে পারতাম। হাশরের

কথাই গোপন করতে পারবে না(১) ।

৪৩. হে মুমিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায়(২)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ

ময়দানে কাফেররা যখন দেখবে, সমস্ত জীব-জন্তু একে অপরের কাছ থেকে কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়ার পর মাটিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের আক্ষেপ হবে এবং কামনা করবে - হায়! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম! যেমন অন্য সূরায় বলা হয়েছে “আর কাফেররা বলবে, কতই না উত্তম হত যদি আমরা মাটি হয়ে যেতাম।” [সূরা আন-নাবা: ৪০]

(১) অর্থাৎ এই কাফেররা নিজেদের বিশ্বাস ও কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছুই গোপন রাখতে পারবে না। তাদের হাত-পা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীকার করবে, নবী-রাসূলগণ সাক্ষ্য দান করবেন এবং আমলনামাসমূহেও সবকিছু বিধৃত থাকবে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কুরআনের এক জায়গায় বলা হয়েছে, ‘কাফেররা কোন কিছুই গোপন করতে পারবে না। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, তারা কছম খেয়ে খেয়ে বলবে ﴿وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ﴾ অর্থাৎ “আল্লাহ্‌র কছম আমরা শির্ক করিনি।” [সূরা আল-আন‘আমঃ ২৩] বাহ্যতঃ এ দু’টি আয়াতের মধ্যে যে বৈপরীত্য দেখা যায় তার কারণ কি? তখন ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা উত্তরে বললেন, ব্যাপারটি এমন হবে যে, যখন প্রথমে কাফেররা লক্ষ্য করবে শুধুমাত্র মুসলিম ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে যাচ্ছে না, তখন তারা একথা স্থির করে নেবে যে, আমাদেরকেও নিজেদের শির্ক ও অসৎকর্মের বিষয় অস্বীকার করা উচিত। হয়ত আমরা এভাবে মুক্তি পেয়েও যেতে পারি। কিন্তু এ অস্বীকৃতির পর স্বয়ং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আরম্ভ করবে এবং গোপন করার যে মতলব তারা স্থির করেছিল, তাতে সম্পূর্ণভাবে অকৃতকার্য হয়ে পড়বে এবং তখন সবই স্বীকার করে নেবে। এজন্যই বলা হয়েছে ﴿وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا﴾ ‘কোন কিছুই গোপন করতে পারবে না’। যদি কেউ ভাল কাজ করে তাও সে বলবে, এক হাদীসে এসেছে হাশরের দিন আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর কোন বান্দাকে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করবেন যাকে তিনি সম্পদ দিয়েছিলেনঃ ‘দুনিয়াতে তুমি কি কাজ করেছ? তখন সে কোন কথাই গোপন করবে না। সে বলবেঃ হে আমার রব, আপনি আমাকে সম্পদ দিয়েছেন, আমি মানুষের সাথে বেচা-কেনা করতাম। আমার স্বভাব ছিল মানুষকে ছাড় দেয়ার। আমি ধনীদের সাথে সহজ ব্যবহার করতাম আর দরিদ্রদেরকে সময় দিতাম। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা বলবেনঃ ‘আমি এটা করার জন্য তোমার চেয়েও বেশী উপযুক্ত। আমার বান্দাকে তোমরা ছাড় দাও।’ [মুসলিমঃ ১৫৬০]

(২) আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন ইসলামী শরী‘আতকে একটি বৈশিষ্ট্য এই দান করেছেন যে, এর প্রতিটি বিধি-বিধানকে তিনি সরল ও সহজ করেছেন। তারই এক বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন যাদের মন-মানসকে একান্ত নিষ্পাপ করে তৈরী করেছিলেন এমন বিশেষ বিশেষ কিছু লোক ছাড়া মদ্যপান ছিল সমগ্র

তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার(১) এবং যদি তোমরা মুসাফির না হও তবে অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যতক্ষন পর্যন্ত না তোমরা গোসল

سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ

আরববাসীর পুরাতন অভ্যাস। কিন্তু বিশেষ বিশেষ লোকেরা কখনো এই দুষ্ট বস্তুর ধারে কাছেও যেতেন না। যেমন, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেও কখনো মদ স্পর্শ করেননি। এছাড়া বলতে গেলে সমগ্র জাতিই ছিল এ বদ অভ্যাসে লিপ্ত। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, কোন বস্তু একবার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে মানুষের পক্ষে তা পরিহার করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে মদ্যপান কিংবা অন্যান্য নেশাজনিত অভ্যাস মানুষকে এমনভাবে কাবু করে বসে যে, তা থেকে বেরিয়ে আসাকে সে মৃত্যুর শামিল মনে করতে থাকে। আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট মদ্যপান ও নেশা করা ছিল হারাম। বিশেষতঃ ইসলাম গ্রহণ করার পর মুসলিমদেরকে এর অভিশাপ থেকে রক্ষা করা ছিল আল্লাহ্ তা‘আলার অভিপ্রায়। কিন্তু সহসা একে হারাম করে দেয়া হলে, মানুষের পক্ষে এ নির্দেশ পালন করা একান্তই কঠিন হত। কাজেই প্রথমে এর উপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল এবং এর অশুভ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্কীকরণের মাধ্যমে মানুষের মন-মস্তিস্ককে একে পরিহার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হল। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে শুধুমাত্র এ হুকুমই দেয়া হয়েছে যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের ধারে কাছেও যেও না। যার মর্ম ছিল এই যে, সালাতের সময় সালাতের প্রতি মনোনিবেশ করা ফরয। এ সময় মদ্যপান করা যাবে না। এতে মুসলিমগণ উপলব্ধি করলেন যে, এটা এমন এক মন্দ বস্তু যা মানুষকে সালাতে বাধা দান করে। কাজেই দেখা গেল অনেকে এ নির্দেশ আসার সাথে সাথেই মদ্যপান পরিহার করলেন এবং অনেকে এর মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত সূরা আল-মায়েদার আয়াতে মদের অপবিত্রতা ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ নাযিল হল এবং যে কোন অবস্থায় মদ্যপান সম্পূর্ণভাবে হারাম হয়ে গেল।

(১) আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মদ হারাম হওয়ার পূর্বে আমাদেরকে এক আনসার দাওয়াত দিল। দাওয়াত শেষে আব্দুর রহমান ইবন আউফ এগিয়ে গিয়ে মাগরিবের সালাতের ইমামতি করলেন। তিনি সূরা আল-কাফেরূন তেলাওয়াত করতে গিয়ে এলোমেলো করে ফেললেন। ফলে এ আয়াত নাযিল হয় যাতে মদ খাওয়ার পর বিবেকের সুস্থতা না ফেরা পর্যন্ত সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। [আল-আহাদীসুল মুখতারাহ্ঃ ২/১৮৮ নং- ৫৬৭, অনুরূপ ২/১৮৭ নং- ৫৬৬; আবু দাউদঃ ৩৬৭১; তিরমিযী: ৩০২৬]

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

কর(১) । আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে অথবা তোমরা নারী সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম কর(২) সুতরাং মাসেহ কর তোমরা তোমাদের চেহারা ও হাত, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল ।

---

(১) অপবিত্র অবস্থা থেকে গোসল করার নিয়ম বর্ণনায় হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানাবতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে দু হাত ধুয়ে নিতেন । তারপর সালাতের অজুর মত অজু করতেন । তারপর পানিতে আঙ্গুল ঢুকিয়ে তা দিয়ে মাথার চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছাতেন । তারপর তার মাথায় তিন ক্রোশ পানি দিতেন এবং সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করতেন । [বুখারীঃ ২৪৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পা ধোয়া ব্যতীত সালাতের অজুর মত অজু করলেন, তার লজ্জাস্থান ধৌত করলেন, যে সমস্ত ময়লা লেগেছিল তাও ধৌত করলেন, তারপর তার নিজের শরীরে পানি প্রবাহিত করলেন । তারপর দু' পা সরিয়ে নিয়ে ধৌত করলেন । এটাই ছিল তার অপবিত্রতা থেকে গোসল করার পদ্ধতি । [বুখারীঃ ২৪৯]

(২) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, এক সফরে তিনি তার বোন আসমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে একটি হার ধার করে নিয়েছিলেন । তিনি সেটা হারিয়ে ফেলেন । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা খুঁজতে এক ব্যক্তিকে পাঠান এবং তিনি তা খুঁজে পান । ইত্যবসরে সালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায়, কিন্তু তাদের নিকট পানি ছিল না । লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করল । তখন তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয় । উসাইদ ইবনে হোদাইর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে বলেন, আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন । যখনি কোন অপছন্দনীয় ব্যাপার আপনার উপর ঘটে গেছে, তখনি তা আপনার এবং উম্মতে মুসলিমার জন্য কল্যাণের কারণ হয়েছে । [বুখারীঃ ৩৩৬, মুসলিমঃ ৩৬৭]

মূলতঃ তায়াম্মুমের হুকুম একটি পুরস্কার- যা এ উম্মতেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য । আল্লাহ্ তা‘আলার কতই না অনুগ্রহ যে, তিনি অযু-গোসল প্রভৃতি পবিত্রতার নিমিত্ত এক বস্তুকে পানির স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন, যার প্রাপ্তি পানি অপেক্ষাও সহজ । বলাবাহুল্য, ভূমি ও মাটি সর্বত্রই বিদ্যমান । হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এ সহজ ব্যবস্থাটি একমাত্র উম্মতে মুহাম্মাদীকেই দান করা হয়েছে ।

৪৪. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছিল? তারা ভ্রান্ত পথ ক্রয় করে এবং তোমরাও পথভ্রষ্ট হও- এটাই তারা চায়(১) ।

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَٰلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا۟ ٱلسَّبِيلَ ﴿٤٤﴾

৪৫. আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদেরকে ভালভাবে জানেন। আর অভিভাবকত্বে আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং সাহায্যেও আল্লাহ্ই যথেষ্ট ।

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾

৪৬. ইয়াহূদীদের মধ্যে কিছু লোক কথাগুলো স্থানচ্যুত করে বিকৃত করে(২) এবং বলে, ‘শুনলাম ও অমান্য করলাম’ এবং শোনে না শোনার মত; আর নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করে এবং দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য করে বলে,

مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَٰعِنَا لَيًّۢا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى ٱلدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

---

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইয়াহূদী নাসরারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হওয়ার পাশাপাশি ঈমানদারদেরকেও পথভ্রষ্ট করতে চায়। অন্য আয়াতে তাদের সংখ্যা অনেক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, তারা মুসলিমদের মুর্তাদ হয়ে যাওয়া কামনা করে। আরও বলা হয়েছে যে, তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও কেবলমাত্র হিংসার বশবর্তী হয়েই তারা এটা করে থাকে। যেমন আল্লাহ্ বলেন, “কিতাবীদের অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর কাফেররূপে ফিরিয়ে নিতে পারত! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে বিদ্বেষবশতঃ (তারা এটা করে থাকে)।”[সূরা আল-বাকারাহ: ১০৯] আরও বলেন, “কিতাবীদের একদল চায় যেন তোমাদেরকে বিপথগামী করতে পারে, অথচ তারা নিজেদেরকেই বিপথগামী করে। আর তারা উপলব্ধি করে না।” [সূরা আলে-ইমরান: ৬৯] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ইয়াহূদীদের নেতাদের মধ্যে রিফা‘আ ইবন যায়েদ যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কথা বলত, তখন সে তার জিহ্বা ঘুরিয়ে বলত: হে মুহাম্মাদ! তুমি ভাল করে আমাদেরকে শোনাও যাতে আমরা বুঝতে পারি। তারপর সে ইসলামের দোষ-ত্রুটি খুজে বেড়াত। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) অর্থাৎ ইয়াহূদীরা তাওরাতে বর্ণিত আল্লাহ্র হুদুদসমূহ বিকৃত করত। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٤٦﴾

‘রাইনা’(১)। কিন্তু তারা যদি বলত, ‘শুনলাম ও মান্য করলাম এবং শুনুন ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন’, তবে তা তাদের জন্য ভাল ও সঙ্গত হত। কিন্তু তাদের কুফরীর জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে লা‘নত করেছেন। ফলে তাদের অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰۤى اَدْبَارِهَاۤ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاۤ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ۭ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٤٧﴾

৪৭. হে কিতাবপ্রাপ্তগণ, তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে আমরা যা নাযিল করেছি তাতে তোমরা ঈমান আন(২), আমরা মুখমণ্ডলগুলোকে বিকৃত করে তারপর সেগুলোকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার আগে(৩) অথবা আস্‌হাবুস্‌ সাব্‌তকে যেরূপ লা‘নত করেছিলাম(৪) সেরূপ তাদেরকে

---

(১) সূরা আল-বাকারাহ এর ১০৪ নং আয়াতে এ শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মূলত: বাক্যটি দ্ব্যর্থবোধক। তারা এটাকে খারাপ অর্থে ব্যবহার করত।

(২) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার একদল ইয়াহূদী সর্দার যেমন আব্দুল্লাহ ইবন সুওরিয়া, কা‘ব ইবন আসওয়াদ প্রমুখদের সাথে কথোপকথন চলার সময় বলেছিলেন, হে ইয়াহূদীরা তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং ঈমান আন। আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা জান যে, আমি যা নিয়ে এসেছি তা বাস্তবিকই হক। তখন তারা বলল, মুহাম্মাদ! আমরা তা জানি না। তারা যা জানত তা অস্বীকার করল এবং কুফরীতে বহাল রইলো। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [তাবারী]

(৩) ঘুরিয়ে দেয়া বা উল্টে দেয়ার মধ্যে দু’টি সম্ভাবনাই থাকতে পারে। মুখমণ্ডলের আকার অবয়ব মুছে দিয়ে গোটা চেহারাকে পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়ে দেয়াও হতে পারে, আবার মুখমণ্ডলকে গর্দানের মত সমান্তরাল করে দেয়াও হতে পারে। অর্থাৎ মুখমণ্ডলকে গর্দানের দিকে উল্টে না দিয়ে বরং গর্দানের মত পরিস্কার ও সমান্তরাল করে দেয়া। [রুহুল মা‘আনী] তবে মুজাহিদ বলেন, এখানে পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ, হক পথ থেকে তাদেরকে বিচ্যুত করে দেয়া যাতে তারা পশ্চাতে ফেলে আসা ভ্রষ্ট পথেই ফিরে যায়। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৪) ‘আসহাবুস সাবত’ অর্থ শনিবারের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ। আল্লাহ্ তা‘আলা

লা'নত করার আগে। আর আল্লাহ্‌র আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।

৪৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক⁽¹⁾ করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন⁽²⁾। আর যে-ই আল্লাহ্‌র সাথে

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ
ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ
ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا ٤٨

ইয়াহূদীদেরকে শনিবারে মাছ শিকার করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তারা সে নির্দেশকে হীলা-বাহানা করে অমান্য করেছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বানরে রূপান্তরিত করেছিলেন।[দেখুন, সূরা আল-বাকারাহ: ৬৫] তা ছিল নিঃসন্দেহে অভিশাপ। এ আয়াতে সে ধরনের অভিশাপের ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। [তাবারী]

(১) আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে যেসব বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে, যে কোন সৃষ্ট বস্তুর ব্যাপারে তেমন কোন বিশ্বাস পোষণ করাই হল শির্ক। অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সৃষ্ট বস্তুকে 'ইবাদাত কিংবা মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শনে আল্লাহ্‌র সমতুল্য মনে করাই শির্ক। জাহান্নামে পৌঁছে মুশরিকরা যে উক্তি করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তা উল্লেখ করেছেন যে, "আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলাম যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য স্থির করেছিলাম।" [সূরা আশ-শু'আরাঃ ৯৭-৯৮] শির্কের প্রকারভেদ সম্পর্কে সূরা আল-বাকারাহ এর ২২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এটা জানা আবশ্যক যে, যুলুম ও অবিচার তিন প্রকার। এক প্রকার যুলুম যা আল্লাহ্ তা'আলা কখনো ক্ষমা করবেন না। দ্বিতীয় প্রকার যুলুম যা মাফ হতে পারে। আর তৃতীয় প্রকার যুলুমের প্রতিশোধ আল্লাহ্ তা'আলা না নিয়ে ছাড়বেন না। প্রথম প্রকার যুলুম হচ্ছে শির্ক, দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহ্‌র হকে ত্রুটি করা এবং তৃতীয় প্রকার বান্দার হক বিনষ্ট করা। [ইবন কাসীর] এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করবেন না। এর বাইরে যত গোনাহ আছে সবই তিনি যার জন্যে ইচ্ছে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে সে অবশ্যই এক বড় মিথ্যা অপবাদ রটনা করল। অন্য আয়াতে অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা শির্ককারীদের মধ্যে যারা তাওবা করবে তাদেরকে ক্ষমা করার কথা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, "আর যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে না, ...তবে যদি তারা তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে"[সূরা আল-ফুরকান:৭০] সুতরাং তাওবাহ করলে শির্কও মাফ হয়ে যায়।

(২) আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ আমরা কবীরা গোনাহ্‌কারীর জন্য ইস্তেগফার করা থেকে বিরত থাকতাম। শেষ পর্যন্ত যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ আয়াত শুনলাম এবং আরো শুনলাম যে, তিনি বলছেনঃ 'আমি আমার দো'আকে গচ্ছিত রেখেছি আমার উম্মতের কবীরা গোনাহ্‌গারদের

শরীক করে, সে এক মহাপাপ রটনা করে।

৪৯. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করে? বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে পবিত্র করেন(১)।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾

সুপারিশ করার জন্য। ইবন উমর বলেনঃ এরপর আমাদের অন্তরে যা ছিল, তা অনেকটা কেটে গেল ফলে আমরা ইস্তেগফার করতে থাকলাম ও আশা করতে থাকলাম। [মুসনাদে আবি ইয়া'লাঃ ৫৮১৩]

(১) আয়াতের ভাষ্য হচ্ছে, নিজেকে কেউ যেন দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে মনে না করে। মূলত: আত্মপ্রশংসা এবং নিজেকে ত্রুটিমুক্ত মনে করা বৈধ নয়। ইয়াহূদীরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে বর্ণনা করত। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে তাদের নিন্দা করে বলেছেন, তাদের দিকে একটু লক্ষ্য করে দেখুন, যারা নিজেরাই নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা করে; তাদের ব্যাপারে বিস্মিত হওয়াই উচিত। এতে প্রতীয়মান হয় যে, কারো পক্ষে নিজের কিংবা অন্য কারো পবিত্রতা বর্ণনা করা জায়েয নয়। এই নিষিদ্ধতার কয়েকটি কারণ রয়েছে-

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মপ্রশংসার কারণ হয়ে থাকে অহমিকা বা আত্মগর্ব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা পরস্পর প্রশংসা করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, তা হচ্ছে জবাই করা।' [ইবন মাজাহ্ঃ ৩৭৪৩] কাতাদা বলেন, এখানে ইয়াহূদীদেরকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। তারা নিজেদের প্রশংসায় কোন প্রকার কসুর করত না। তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তান-সন্ততি ও তাঁর প্রিয়পাত্র বলে দাবী করত। [তাবারী]

দ্বিতীয়তঃ শেষ পরিণতি সম্পর্কে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই অবগত যে, তা পবিত্রতা কিংবা পরহেযগারীর মধ্যেই হবে কিনা। কাজেই নিজে নিজেকে পবিত্র বলে আখ্যায়িত করা তাকওয়ার পরিপন্থি। এক বর্ণনায় এসেছে, সালমা বিনতে যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা তার মাতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? তখন যেহেতু আমার নাম ছিল بَرَّة (বার্‌রাহ্ বা পাপমুক্ত), কাজেই আমি তাই বললাম। তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে পাপমুক্ত বলে বর্ণনা করো না। কারণ, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন, তোমাদের মধ্যে কে পবিত্র। অতঃপর বার্‌রাহ্ নামটি পাল্টিয়ে তিনি যয়নব রেখে দিলেন।' [বুখারীঃ ৫৮৩৯, মুসলিমঃ ২১৪১]

নিষিদ্ধতার আরো এক কারণ এই যে, অধিকাংশ সময় এ ধরনের দাবী করতে গিয়ে মানুষের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে যে, সে লোক আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এজন্য প্রিয় যে, সে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। অথচ কথাটি সর্বৈব

আর তাদের উপর সূতা পরিমাণও যুলুম করা হবে না।

৫০. দেখুন! তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে কিরূপ মিথ্যা উদ্ভাবন করে; আর প্রকাশ্য পাপ হিসেবে এটাই যথেষ্ট।

اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَكَفٰى
بِهٖٓ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٠﴾ ع

অষ্টম রুকূ’

৫১. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছিল, তারা জিব্‌ত ও তাগূতে বিশ্বাস করে⁽¹⁾? তারা কাফেরদের

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ
يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ
لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰٓؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ

মিথ্যা। কারণ, মানুষের মধ্যে অসংখ্য ক্রুটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান থাকে।

নিষিদ্ধতার আরেক কারণ হল, মানুষ জানে না তার কৃত আমল আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হচ্ছে কিনা। কেননা, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ‘যখন ﴿وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ﴾ ‘আর যারা তাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা দেয় এমতাবস্থায় যে, তাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত এজন্যে যে তারা তাদের রব এর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।’[সূরা আল-মু’মিনূনঃ ৬০] এ আয়াত নাযিল হল, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম তারা কি ঐ সম্প্রদায় যারা মদ খায় এবং চুরি করে? তিনি বললেন, না, হে সিদ্দিকের মেয়ে! তারা হল ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা সালাত-সাওম আদায় করে এবং ভয় করে যে তাদের থেকে কবুল করা হবে না।’ [তিরমিযীঃ ৩১৭৫, ইবন মাজাহ্‌ঃ ৪১৯৮, মুসনাদে আহমাদঃ ৬/১৫৯]

(১) আয়াতে ‘জিব্‌ত’ ও ‘তাগূত’ শীর্ষক দু’টি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। শব্দ দু’টির মর্ম সম্পর্কে তাফসীরকার মনীষীবৃন্দের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, আবিসিনীয় ভাষায় ‘জিব্‌ত’ বলা হয় জাদুকরকে। আর ‘তাগূত’ বলা হয় গণক বা জ্যোতিষীকে। উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, ‘জিব্‌ত’ অর্থ জাদু এবং ‘তাগূত’ অর্থ শয়তান। মালেক ইবন আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত যে সমস্ত জিনিসের উপাসনা করা হয়, সে সবই তাগূত বলে অভিহিত হয়। ইমাম কুরতুবী বলেন যে, মালেক ইবন আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর উক্তিটিই অধিক পছন্দনীয়। তার কারণ, কুরআন থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লাহ্ বলেনঃ “আল্লাহ্‌র ‘ইবাদাত কর এবং তাগূত থেকে বেঁচে থাক।” [সূরা আন-নাহল: ৩৬] কিন্তু উল্লেখিত বিভিন্ন মতের মাঝে কোন বিরোধ নেই। কাজেই এর যে কোনটিই গ্রহণ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ‘জিব্‌ত’ প্রতিমাকেই বোঝাত, পরে

اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ﴿٥١﴾

সম্বন্ধে বলে, ‘এদের পথই মুমিনদের চেয়ে প্রকৃষ্টতর(১)।’

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۗ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ

৫২. এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ্ লা‘নত

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য পূজ্য বস্তুতে এর প্রয়োগ হতে আরম্ভ করে। [রুহুল মা‘আনী] তাগূতের অর্থ ও প্রকারভেদ এবং প্রধান প্রধান তাগূত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা আল-বাকারাহ্‌র ২৫৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় করা হয়েছে।

(১) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ইয়াহূদীদের সর্দার হুইয়াই ইবন আখতাব ও কা‘ব ইবন আশরাফ ওহুদ যুদ্ধের পর নিজেদের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে কুরাইশদের সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে মক্কায় এসে উপস্থিত হয়। ইয়াহূদী সর্দার কা‘ব ইবন আশরাফ আবু সুফিয়ানের কাছে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে তাদের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। তখন মক্কাবাসীরা কা‘ব ইবন আশরাফকে বলল, তোমরা হলে একটি প্রতারক সম্প্রদায়। সত্য সত্যই যদি তোমরা তোমাদের এই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সত্য হয়ে থাক, তবে আমাদের এ দু’টি মূর্তির (জিব্‌ত ও তাগূতের) সামনে সিজ্‌দা কর। সুতরাং সে কুরাইশদেরকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাই করল। তারপর কা‘ব কুরাইশদেরকে বলল, তোমাদের মধ্য থেকে ত্রিশ জন এবং আমাদের মধ্য থেকে ত্রিশ জন লোক এগিয়ে আস, যাতে আমরা সবাই মিলে কা‘বার প্রভূর সামনে দাঁড়িয়ে এ ওয়াদা করে নিতে পারি যে, আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। কা‘বের এ প্রস্তাব কুরাইশরাও পছন্দ করল এবং সেভাবে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যজোট গঠন করল। অতঃপর আবু সুফিয়ান কা‘বকে বলল, তোমরা হলে শিক্ষিত লোক; তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র কিতাব রয়েছে, কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ মূর্খ। সুতরাং তুমিই আমাদেরকে বল, প্রকৃতপক্ষে আমরা ন্যায়ের উপর রয়েছি, নাকি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ন্যায়ের উপর রয়েছেন? তখন কা‘ব জিজ্ঞেস করল, তোমাদের দ্বীন কি? আবু সুফিয়ান উত্তরে বলল, আমরা হজের জন্য নিজেদের উট জবাই করি এবং সেগুলোর দুধ খাওয়াই, মেহমানদিগকে দাওয়াত করি, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখি এবং বায়তুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র ঘর)-এর তাওয়াফ করি, পক্ষান্তরে এর বিপরীতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পৈত্রিক দ্বীন পরিহার করেছেন, নিজের আত্মীয়-স্বজন থেকে পৃথক হয়ে গেছেন এবং সর্বোপরি তিনি আমাদের সনাতন দ্বীনের বিরুদ্ধে নিজের এক নতুন দ্বীন উপস্থাপন করেছেন। এসব কথা শোনার পর কা‘ব ইবন আশরাফ বলল, তোমরাই ন্যায়ের উপর রয়েছ। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোমরাহ্ হয়ে গেছেন। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা‘আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করে ওদের মিথ্যা ও প্রতারণার নিন্দা করেন। [দেখুন- সহীহ্ ইবন হিব্বানঃ ৬৫৭২]

فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا (٥٢)

করেছেন(১) এবং আল্লাহ্ যাকে লা'নত করেন আপনি কখনো তার কোন সাহায্যকারী পাবেন না(২)।

اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا (٥٣)

৫৩. তবে কি রাজশক্তিতে তাদের কোন অংশ আছে? সে ক্ষেত্রেও তো তারা কাউকে এক কপর্দকও দেবে না(৩)।

---

(১) আল্লাহ্র অভিসম্পাত দুনিয়া ও আখেরাতের অপমানের কারণ। লা'নত ও অভিসম্পাত এর অর্থ হল, আল্লাহ্র রহমত ও করুণা থেকে দূরে সরে পড়া- চরম অপমান, অপদস্থতা। যার উপর আল্লাহ্র লা'নত পতিত হয় সে কখনো আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করতে পারে না। তাদের সম্পর্কে অতি কঠিন ভর্ৎসনার কথা বলা হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে, "যাদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত হয়েছে, তাদের যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই নিহত অথবা ধৃত হবে।" [সূরা আল-আহযাবঃ ৬১] এটা তাদের পার্থিব অপমান। আখেরাতে তাদের অপমান এর চেয়েও কঠিন হবে।

(২) এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, যার উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হয়, তার কোন সাহায্যকারী থাকে না। এখন চিন্তা করার বিষয় এই যে, আল্লাহ্র লা'নতের যোগ্য কারা? এক হাদীসে আছে যে, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদ গ্রহীতা এবং সুদ দাতা, সুদ সংক্রান্ত দলীল সম্পাদনকারী এবং সুদের লেনদেনের সাক্ষী সবার প্রতিই অভিসম্পাত করেছেন। এদের সবাই পাপের ক্ষেত্রে সমান।' [মুসলিমঃ ১৫৯৮] অন্য এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'যে লোক লূত 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের অনুরূপ কর্মে লিপ্ত হবে সে অভিশপ্ত হবে।' [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ৪/৩৯৬] অতঃপর তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা চোরদের প্রতিও অভিসম্পাত করেন। যে ডিম কিংবা রশির মত সাধারণ বস্তুও চুরি থেকে বিরত থাকে না, তারও হাত কাটা হয়।' [বুখারীঃ ৬৪০১] আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, 'সুদ গ্রহীতা ও দাতার উপর আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত এবং সে সমস্ত নারীর উপর যারা নিজেদের শরীর কেটে উল্কি আঁকে, যে অন্যের শরীর কেটেও উল্কি এঁকে দেয়, তেমনিভাবে চিত্রকারের উপরও আল্লাহ্র লা'নত।' [বুখারীঃ ১৯৮০] অপর এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন মদ্যপায়ীর প্রতি, মদ যে ব্যক্তি পান করায় তার প্রতি, তার বিক্রেতা ও ক্রেতার প্রতি, যে মদের নির্যাস বের করে তার প্রতি এবং যারা মদ্য বহন করে তাদের সবার প্রতি।' [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩৭]

(৩) ইবনে আব্বাস বলেন, খেজুরের দানার উপরে বিন্দুর মত যে ছিদ্র থাকে তাকেই আরবীতে نقير 'নাকীর' বলা হয়। [তাবারী] মোটকথা: সামান্যতম জিনিস বোঝানোর জন্যই এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

৫৪. অথবা আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন সে জন্য কি তারা তাদেরকে ঈর্ষা করে⁽¹⁾? তবে আমরা তো ইব্‌রাহীমের বংশধরকেও কিতাব ও হিকমত দিয়েছিলাম এবং আমরা তাদেরকে বিশাল রাজ্য দান করেছিলাম ।

أَمۡ يَحۡسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ
مِن فَضۡلِهِۦۖ فَقَدۡ ءَاتَيۡنَآ ءَالَ إِبۡرَٰهِيمَ
ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَءَاتَيۡنَٰهُم مُّلۡكًا عَظِيمٗا ٥٤

৫৫. অতঃপর তাদের কিছু সংখ্যক তাতে ঈমান এনেছিল এবং কিছু সংখ্যক তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল⁽²⁾; আর

فَمِنۡهُم مَّنۡ ءَامَنَ بِهِۦ وَمِنۡهُم مَّن صَدَّ عَنۡهُۚ
وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ٥٥

---

(১) এ আয়াতে ইয়াহূদীদের হিংসার কঠোর নিন্দা করা হয়েছে । আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে জ্ঞানৈশ্বর্য ও শান-শওকত দান করেছিলেন, তা দেখে ইয়াহূদীরা হিংসার অনলে জ্বলে মরত । আল্লাহ্ তা‘আলা এখানে তাদের সে হিংসা বিদ্বেষের কঠোর নিন্দা করেছেন এবং তাদের বিদ্বেষকে একান্ত অযৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করে পরবর্তী আয়াতগুলোতে তার কারণ বর্ণনা করেছেন । তা হল এই যে, তোমাদের এই হিংসা ঈর্ষা ও বিদ্বেষের কারণটা কি? যদি এ কারণ হয়ে থাকে যে, তোমরাই প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী অথচ তা তোমাদের হাতে না এসে তিনি পেয়ে গেছেন, তাহলে তোমাদের এ ধারণা যে একান্তই ভ্রান্ত তা সুস্পষ্ট । কারণ এখন তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত । কিন্তু তোমরা যদি তা থেকে কোন অংশ প্রাপ্ত হতে, তাহলে তোমরা তো অন্য কাউকে একটি কড়িও দিতে না । পক্ষান্তরে যদি তোমাদের এ বিদ্বেষ এ কারণে হয়ে থাকে যে, রাজ-ক্ষমতা না হয় আমরা নাই পেলাম, কিন্তু তাঁর হাতে যাবে কেন? রাষ্ট্রের সাথে তাঁর কি সম্পর্ক? তাহলে তার উত্তর হল এই যে, ইনিও নবীগণেরই বংশধর, যাঁদের নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পূর্ব থেকেই ছিল । কাজেই রাষ্ট্র কোন অপাত্রে অর্পিত হয়নি । অতএব, তোমাদের ঈর্ষা একান্তভাবেই অযৌক্তিক ।

এখন জানা দরকার ঈর্ষা কি? আর তার পরিণামই বা কি? আলেমগণ বলেন, হাসাদ বা ঈর্ষা হচ্ছে, ‘অন্যের প্রাপ্ত নেয়ামতের অপসারণ কামনা করা ।’ যা হারাম ও নিন্দনীয় । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘তোমরা পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে রেখো না; বরং আল্লাহ্‌র বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও । আর কোন মুসলিম ভাইয়ের পক্ষে অন্য মুসলিম ভাইয়ের প্রতি তিন দিনের বেশী সময় পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা জায়েয নয় ।’ [বুখারী: ৬০৭৬; মুসলিমঃ ২৫৫৮]

(২) মুজাহিদ বলেন, অর্থাৎ তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

দগ্ধ করার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট।

৫৬. নিশ্চয় যারা আমাদের আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে অবশ্যই তাদেরকে আমরা আগুনে পোড়াব; যখনই তাদের চামড়া পুড়ে পাকা দগ্ধ হবে তখনই তার স্থলে নতুন চামড়া বদলে দেব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে⁽১⁾। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

৫৭. আর যারা ঈমান আনে এবং ভাল কাজ করে, অচিরেই আমরা তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার পাদদেশে নদী-নালাসমূহ প্রবাহিত; যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, সেখানে তাদের জন্য পবিত্র স্ত্রী থাকবে এবং তাদেরকে আমরা চিরস্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবেশ করাব⁽২⁾।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

৫৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত⁽৩⁾ তার হকদারকে

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا

সাল্লামের উপর ঈমান এনেছিল। আর কেউ কেউ রাসূলের পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখছিল। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন যে, তাদের শরীরের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন সেগুলো পাল্টে দেয়া হবে এবং এ কাজটি এত দ্রুতগতিতে সম্পাদিত হবে যে, এক মুহূর্তে শতবার চামড়া পাল্টানো যাবে। হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, 'আগুন তাদের চামড়াকে একদিনে সত্তর হাজার বার খাবে। যখন তাদের চামড়া খেয়ে ফেলবে, অমনি সেসব লোককে বলা হবে, তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাও। সাথে সাথে সেগুলো পূর্বের মত হয়ে যাবে। [ইবন কাসীরঃ ১/৫১৪]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে এর ছায়ায় যদি কোন আরোহণকারী ভ্রমণ করতে চায় তাহলে একশত বছর ভ্রমণ করতে পারবে। তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াত পড়তে পার "আর সম্প্রসারিত ছায়া" [সূরা আল ওয়াকি'য়াঃ ১৩০, বুখারীঃ ৩২৫২]

(৩) আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াতটি নাযিল হওয়ার একটি বিশেষ ঘটনা

রয়েছে। তা হল এই যে, ইসলাম-পূর্বকালেও কা'বা ঘরের সেবা করাকে এক বিশেষ মর্যাদার কাজ মনে করা হত। কা'বার কোন বিশেষ খেদমতের জন্য যারা নির্বাচিত হত, তারা গোটা সমাজ তথা জাতির মাঝে সম্মানিত ও বিশিষ্ট বলে পরিগণিত হত। সে জন্যই বায়তুল্লাহ্‌র বিশেষ খেদমত বিভিন্ন লোকের মাঝে ভাগ করে দেয়া হত। জাহেলিয়াত আমল থেকেই হজের মওসূমে হাজীদেরকে 'যমযম' কূপের পানি পান করানোর সেবা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর উপর ন্যস্ত ছিল। একে বলা হত 'সিকায়া'। অনুরূপই কা'বা ঘরের চাবি নিজের কাছে রাখা এবং নির্ধারিত সময়ে তা খুলে দেয়া ও বন্ধ করার ভার ছিল উসমান ইবন তালহার উপর। এ ব্যাপারে স্বয়ং উসমান ইবন তালহার ভাষ্য হল এই যে, জাহেলিয়াত আমলে আমরা সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন বায়তুল্লাহ্‌র দরজা খুলে দিতাম এবং মানুষ তাতে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করত। হিজরতের পূর্বে একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় সাহাবীসহ বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে গেলে উসমান (যিনি তখনো পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি) তাকে ভিতরে প্রবেশ করতে বাধা দিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ধৈর্য ও গাম্ভীর্য সহকারে উসমানের কটুক্তিসমূহ সহ্য করে নিলেন। অতঃপর বললেন, হে উসমান! হয়ত তুমি এক সময় বায়তুল্লাহ্‌র এই চাবি আমার হাতেই দেখতে পাবে। তখন যাকে ইচ্ছা এই চাবি অর্পণ করার অধিকার আমারই থাকবে। উসমান ইবন তালহা বলল, তাই যদি হয়, তবে সেদিন কুরাইশরা অপমানিত অপদস্থ হয়ে পড়বে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, তা নয়। তখন কুরাইশরা আযাদ হবে, তারা হবে যথার্থ সম্মানে সম্মানিত। এ কথা বলতে বলতে তিনি বায়তুল্লাহ্‌র ভিতরে প্রবেশ করলেন। (উসমান বললেন) তারপর আমি যখন আমার মনের ভিতর অনুসন্ধান করলাম, তখন আমার যেন নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তিনি যা কিছু বললেন, তা অবশ্যই ঘটবে। সে মুহূর্তেই আমি মুসলিম হয়ে যাওয়ার সংকল্প নিয়ে নিলাম। কিন্তু আমি আমার সম্প্রদায়ের মতিগতি পরিবর্তিত দেখতে পেলাম। তারা আমাকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করতে লাগল। কাজেই আমি আর আমার (মুসলিম হওয়ার) সংকল্প বাস্তবায়িত করতে পারলাম না। অতঃপর মক্কা বিজিত হয়ে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে বায়তুল্লাহ্‌র চাবি চাইলেন। আমি তা পেশ করে দিলাম। তখন তিনি পুনরায় আমার হাতেই সে চাবি ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেনঃ এই নাও, এখন থেকে এ চাবি কেয়ামত পর্যন্ত তোমার বংশধরদের হাতেই থাকবে। অন্য যে কেউ তোমাদের হাত থেকে ফিরিয়ে নিতে চাইবে, সে হবে যালেম, অত্যাচারী। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের হাত থেকে এ চাবি ফিরিয়ে নেবার কোন অধিকার কারোরই থাকবে না। [দেখুন- তাবরানীঃ ১১/১২০]

আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, যার দায়িত্বে কোন আমানত থাকবে, সে আমানত প্রাপককে পৌঁছে দেয়া তার একান্ত কর্তব্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম

حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

ফিরিয়ে দিতে(১)। তোমরা যখন

আমানত প্রত্যর্পণের ব্যাপারে বিশেষ তাকীদ প্রদান করেছেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এমন খুব কম হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ভাষণ দিয়েছেন অথচ তাতে একথা বলেননি - 'যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার মধ্যে ঈমান নেই। আর যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিয়মানুবর্তিতা নেই, তার দ্বীন নেই'। [মুসনাদে আহমাদ ৩/১৩৫] তাছাড়া আমানতদারী না থাকা মুনাফেকীর একটি আলামত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মুনাফেকীর লক্ষণসমূহ বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি লক্ষণ এটাও বলেছিলেন যে, যখন তার কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন সে তাতে খেয়ানত করে। [বুখারীঃ ৩৩; মুসলিমঃ ৫৯]

(১) এখানে লক্ষণীয় যে, কুরআনুল কারীম আমানতের বিষয়টিকে أمانات বহুবচনে উল্লেখ করেছে। এতে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, কারো নিকট অপর কারো কোন বস্তু বা সম্পদ গচ্ছিত রাখাটাই শুধুমাত্র 'আমানত' নয়, যাকে সাধারণতঃ আমানত বলে অভিহিত করা হয় এবং মনে করা হয়; বরং আমানতের আরো কিছু প্রকারভেদ রয়েছে। আয়াতের শানে-নুযূল প্রসঙ্গে উপরে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, তাও কোন বস্তুগত আমানত ছিল না। কারণ, বায়তুল্লাহ্‌র চাবি বিশেষ কোন বস্তু নয়, বরং তা ছিল বায়তুল্লাহ্‌র খেদমতের একটা পদের নিদর্শন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রীয় যত পদ ও পদমর্যাদা রয়েছে, সেসবই আল্লাহ্ তা'আলার আমানত। যাদের হাতে নিয়োগ-বরখাস্তের অধিকার রয়েছে সে সমস্ত কর্মকর্তা ও অফিসারবৃন্দ হলেন সে পদের আমানতদার। কাজেই তাদের পক্ষে কোন পদ এমন কাউকে অর্পণ করা জায়েয নয়, যে লোক তার যোগ্য নয়, বরং প্রতিটি পদের জন্য নিজের ক্ষমতা ও সাধ্যানুযায়ী যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান করা কর্তব্য। যোগ্যতা ও পরিপূর্ণ শর্ত মোতাবেক কোন লোক পাওয়া না গেলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে যোগ্যতা ও আমানতদারী তথা সততার দিক দিয়ে যে সবচেয়ে অগ্রবর্তী হবে, তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমানতের গুরুত্ব লক্ষ্য করে এক বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ সমস্ত গোনাহের কাফফারা হলেও আমানতের কাফফারা হয় না। জিহাদে শহীদ ব্যক্তিকে সেদিন হাজির করে বলা হবে, আমানত আদায় কর, সে বলবে, কোত্থেকে তা আদায় করব? দুনিয়া তো শেষ হয়ে গেছে। তখন তাকে হাবীয়া জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। সে সেখানে গেলে আমানতকে যেদিন ত্যাগ করেছিল সেদিনের রূপে দেখতে পাবে। সে তখন তা ধরে কাধে নিয়ে আসতে চাইবে, যখনি সেখান থেকে সে বের হতে যাবে, তখন আমানত পালিয়ে যাবে, আর এভাবে সে আমানতের পিছনে সবসময় ছুটতে থাকবে। তারপর আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উপরোক্ত আয়াত পাঠ করলেন। [আল-মাতালিবুল আলীয়া, হিলইয়াতুল আউলিয়া, মাকারিমুল আখলাক] এ আমানতের পরিচয় সম্পর্কে আবুল আলীয়া বলেন, যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যা নিষেধ করা হয়েছে তা সবই আমানত। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে(১)। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট(২)! নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা(৩)।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟
ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى

৫৯. হে ঈমাদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, আরও আনুগত্য কর তোমাদের

---

(১) এ আয়াতে ইসলামের কয়েকটি মৌলিক নীতির আলোচনাও এসে গেছে। প্রথমতঃ প্রকৃত হুকুম ও নির্দেশ দানের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। পৃথিবীর শাসকবর্গ তাঁর আজ্ঞাবহ। এতে প্রতীয়মান হয় যে, শাসনক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের মালিকও একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই। দ্বিতীয়তঃ সরকারী পদসমূহ অধিবাসীদের অধিকার নয়, যা জনসংখ্যার হারে বন্টন করা যেতে পারে; বরং এগুলো হল আল্লাহ্ প্রদত্ত আমানত, যা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট দায়িত্বের পক্ষে যোগ্য ও যথার্থ লোককেই দেয়া যেতে পারে। তৃতীয়তঃ পৃথিবীতে মানুষের যে শাসন, তা শুধুমাত্র একজন প্রতিনিধি ও আমানতদার হিসেবেই হতে পারে। তারা দেশের আইন প্রণয়নে সে সমস্ত নীতিমালার অনুসরণে বাধ্য থাকবে যা একক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বাতলে দেয়া হয়েছে। চতুর্থতঃ তাদের নিকট যখন কোন মোকদ্দমা আসবে, তখন বংশ, গোত্র, বর্ণ, ভাষা এমনকি দ্বীন ও মতবাদের পার্থক্য না করে সঠিক ও ন্যায়সংগত মীমাংসা করে দেয়া শাসন কর্তৃপক্ষের উপর ফরয। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, শাসনকতৃপক্ষের উপর ওয়াজিব হলো, আল্লাহ্‌র আইন অনুসারে বিচার করা, আমানত আদায় করা। যদি তারা সেটা করে তবে জনগনের উপর কর্তব্য হবে তার কথা শোনা, আনুগত্য করা, তার আহ্বানে সাড়া দেয়া। [তাবারী]

(২) এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা খুবই উত্তম। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা সবার ফরিয়াদই শোনেন এবং যে লোক বলার কিংবা ফরিয়াদ করার সামর্থ্য রাখে না, তিনি তার অবস্থাও উত্তমভাবে দেখেন। অতএব তাঁর রচিত নীতিমালাই সর্বদা সকল রাষ্ট্রের জন্য সর্বযুগে উপযোগী হতে পারে। পক্ষান্তরে মানব রচিত নীতিমালা শুধুমাত্র নিজেদের পরিবেশেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেগুলোরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

(৩) এ আয়াতের তাফসীর ইমাম আবু দাউদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি তার কানের উপর রাখলেন এবং পরবর্তী আঙ্গুলটি রাখলেন তার চোখের উপর। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র চোখ ও কান রয়েছে। [আবু দাউদ: ৪৭২৮]

মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের(১), অতঃপর কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখেরাতে ঈমান এনে থাক। এ পন্থাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

নবম রুকূ’

৬০. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا
أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ

---

(১) ‘উলুল আমর’ আভিধানিক অর্থে সে সমস্ত লোককে বলা হয়, যাদের হাতে কোন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত থাকে। সে কারণেই ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা, মুজাহিদ ও হাসান বসরী রাহিমাহুমাল্লাহ্ প্রমূখ মুফাস্‌সিরগণ ওলামা ও ফোকাহা সম্প্রদায়কে ‘উলুল আমর’ সাব্যস্ত করেছেন। তারাই হচ্ছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েব বা প্রতিনিধি। তাদের হাতেই দ্বীনী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত। মুফাস্‌সিরীনের অপর এক জামা‘আত-যাদের মধ্যে আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু প্রমূখ সাহাবায়ে কেরামও রয়েছেন-বলেছেন যে, ‘উলুল আমর’ এর অর্থ হচ্ছে সে সমস্ত লোক, যাদের হাতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত। ইমাম সুদ্দী এ মত পোষণ করেন। এছাড়া তাফসীরে ইবন কাসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ শব্দটির দ্বারা (ওলামা ও শাসক) উভয় শ্রেণীকেই বোঝায়। কারণ, নির্দেশ দানের বিষয়টি তাঁদের উভয়ের সাথেই সম্পর্কিত। আল্লামা আবু বকর জাস্‌সাস এতদুভয় মত উদ্ধৃত করার পর বলেছেন, সঠিক ব্যাপার হলো এই যে, এতদুভয় অর্থই ঠিক। কারণ, ‘উলুল আমর’ শব্দটি উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবশ্য এতে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন যে, ‘উলুল আমর’ বলতে ফকীহ্‌গণকে বোঝানো যেতে পারে না। তার কারণ, أُولُوا الأَمْر (উলুল আমর) শব্দটি তার শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে সে সমস্ত লোককে বোঝায়, যাদের হুকুম বা নির্দেশ চলতে পারে। বলাবাহুল্য, এ কাজটি ফকীহ্‌গণের নয়। প্রকৃত বিষয় হলো এই যে, হুকুম চলার দু’টি প্রেক্ষিত রয়েছে। (এক) জবরদস্তিমূলক। এটা শুধুমাত্র শাসকগোষ্ঠী বা সরকার দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। (দুই) বিশ্বাস ও আস্থার দরুন হুকুম মান্য করা। আর সেটা ফকীহ্‌গণই অর্জন করতে পেরেছিলেন এবং যা সর্বযুগে মুসলিমদের অবস্থার দ্বারা প্রতিভাত হয়। দ্বীনী ব্যাপারে সাধারণ মুসলিমগণ নিজের ইচ্ছা ও মতামতের তুলনায় আলেম সম্প্রদায়ের নির্দেশকে অবশ্য পালনীয় বলে সাব্যস্ত করে থাকে। তাছাড়া শরী‘আতের দৃষ্টিতেও সাধারণ মানুষের জন্য আলেমদের হুকুম মান্য করা ওয়াজিবও বটে। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রেও ‘উলুল আমর’-এর প্রয়োগ যথার্থ হবে।

يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن
يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ ۖ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ
ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾

হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়?

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى
ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ
صُدُودًا ﴿٦١﴾

৬১. তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে আস, তখন মুনাফিকদেরকে আপনি আপনার কাছ থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখবেন(১)।

فَكَيْفَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ
أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ
إِلَّآ إِحْسَٰنًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾

৬২. অতঃপর কি অবস্থা হবে, যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন মুসীবত হবে? তারপর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে আপনার কাছে এসে বলবে, ‘আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ছাড়া অন্য কিছুই চাইনি।’

---

(১) অর্থাৎ তারা রাসূলের কাছে আসার ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে অনীহা ব্যক্ত করেছে। এটা তাদের অহংকারেরই ফলশ্রুতি। তাদের এ অভ্যাস সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘আলা অন্য আয়াতেও বলেছেন, “আর তাদেরকে যখন বলা হয়, ‘আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তোমরা তা অনুসরণ কর।’ তারা বলে, ‘বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব।” [সূরা লুকমান:২১] মোট কথা: এখানে বলা হয়েছে যে, পারস্পারিক বিবাদ-বিসংবাদের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কৃত মীমাংসাকে অমান্য করা কোন মুসলিমের কাজ হতে পারে না। যে কেউ এমন কাজ করবে, সে মুনাফেক ছাড়া আর কিছু নয়। এরা এমন লোক, যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা সে নির্দেশের প্রতি চলে এসো, যা আল্লাহ্ তা‘আলা নাযিল করেছেন এবং চলে এসো তাঁর রাসূলের দিকে, তখন এসব মুনাফেক আপনার দিকে আসতে অনীহা প্রকাশ করে। মুমিনরা কখনো এধরনের কাজ করতে পারে না। তাদের কথা ও কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, “মুমিনদের উক্তি তো এই---যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তখন তারা বলে, ‘আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম।” [সূরা আন-নূর:৫১]

৬৩. এরাই তারা, যাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ্ তা জানেন। কাজেই আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন, তাদেরকে সদুপদেশ দিন এবং তাদেরকে তাদের মর্ম স্পর্শ করে- এমন কথা বলুন।

أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ
قَوْلًا بَلِيغًا ٦٣

৬৪. আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে কেবলমাত্র আনুগত্য করার জন্যই আমরা রাসূলদের প্রেরণ করেছি। যখন তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করে তখন তারা আপনার কাছে আসলে ও আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে তারা অবশ্যই আল্লাহ্‌কে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাবে(১)।

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ
اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ
فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ٦٤

৬৫. কিন্তু না, আপনার রবের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষন পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের(২) বিচার

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا

---

(১) ৬১ নং আয়াত থেকে এ আয়াত পর্যন্ত মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে হেদায়াত দেয়া হয়েছে। তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে আরও বলা হয়েছে যে, রাসূল যদি তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চায় তবে আল্লাহ্‌কে তারা ক্ষমাশীল পাবে। এ আয়াতটি মুনাফিকদের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং রাসূলের জীবদ্দশায়ই তাঁর পক্ষে তাদের কথা শোনা ও তাদের জন্য দো‘আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা সম্ভব। রাসূলের মৃত্যুর পর তার কবরের কাছে এসে এ আয়াত তেলাওয়াত করে রাসূলের কাছে দো‘আ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও শির্ক। অনুরূপভাবে রাসূলের মৃত্যুর পর তার কবরের কাছে এসে আল্লাহ্‌র কাছে তার জন্য দো‘আ করা বা ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য আহ্বান করা বেদ‘আত ও শির্কের মাধ্যম। সাহাবায়ে কেরাম, তাবে‘য়ীন, হেদায়াতের ইমামগণ যেমন ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ্ সহ কেউই এ ধরনের কাজ করেন নি। তারা এটাকে জায়েয মনে করতেন না। কোন কোন কবরপুজারী কিছু কাহিনী রটনা করে এর সপক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতে চেষ্টা করে মানুষের ঈমান নষ্ট করার পাঁয়তারা করতে পারে। এ ব্যাপারে আমাদের সাবধান থাকা উচিত।

(২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের বলেন, আনসারী এক ব্যক্তির সাথে খেজুর গাছে পানি দেয়া

قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ⁽٦٥⁾

ভার আপনার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর আপনার মীমাংসা সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে(১) এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়(২) ।

নিয়ে তার ঝগড়া হয় । আনসারী বলল, পানির পথ পরিস্কার করে দাও যাতে তা আমার জমির উপর যায় । যুবায়ের তা দিতে অস্বীকার করলে তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শালিসের জন্য আসলেন । রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব শুনে বললেনঃ ‘যুবায়ের তুমি তোমার জমিতে পানি দেয়ার পর তোমার পড়শীর জমিতে পানি দিয়ে দিও । লোকটি তা শুনে বলল, আপনার ফুফাত ভাই তো তাই । এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা রক্তবর্ণ ধারণ করল এবং তিনি বললেন, যুবায়ের তুমি তোমার জমিতে পানি দেয়ার পর তা দেয়াল পর্যন্ত আটকে রাখ । যুবায়ের বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, আমার মনে হয় এ আয়াতটি এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাযিল হয়েছে । [বুখারীঃ ২৩৫৯, ২৩৬০, মুসলিমঃ ২৩৫৭] এ দ্বারা এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র রাসূলের আদেশ-নিষেধ নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া শুধু আচার অনুষ্ঠান কিংবা অধিকারের সাথেই সম্পৃক্ত নয়; আকীদা এবং অপরাপর বৈষয়িক বিষয়েও ব্যাপক । অতএব, কোন সময় কোন বিষয়ে পারস্পারিক মতবিরোধ দেখা দিলে বিবাদ পরিহার করে উভয় পক্ষকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এবং তার অবর্তমানে তার প্রবর্তিত শরী‘আতের আশ্রয়ে গিয়ে মীমাংসা অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয ।

(১) এতে এ কথাও জানা গেল যে, যে কাজ বা বিষয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কথা বা কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত, তা সম্পাদন করতে গিয়ে মনে কোন রকম সংকীর্ণতা অনুভব করাও ঈমানের দূর্বলতার লক্ষণ । উদাহারণতঃ যে ক্ষেত্রে শরী‘আত তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করার অনুমতি দিয়েছে, সে ক্ষেত্রে যদি কেউ সম্মত না হয় তবে একে পরহেযগারী বলে মনে করা যাবে না, বরং এটা একান্তই মানসিক ব্যাধি । রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা কেউ বেশী পরহেযগার হতে পারে না । যে অবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে সালাত আদায়ের অনুমতি দিয়েছেন এবং নিজেও বসে সালাত আদায় করেছেন, কারো মন যদি এতে সম্মত না হয় এবং অসহনীয় পরিশ্রম ও কষ্ট সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তবে তার জেনে রাখা উচিত যে, তার মন ব্যাধিগ্রস্ত ।

(২) এ আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহত্ত্ব ও সুউচ্চ মর্যাদার বিষয় প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের অসংখ্য আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের অপরিহার্যতার বিষয়টি সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে । এ আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা শপথ করে বলেছেন যে, কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন কিংবা মুসলিম হতে পারে না যতক্ষণ না সে ধীরস্থির

৬৬. আর যদি আমরা তাদেরকে আদেশ দিতাম যে, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর বা আপন গৃহ ত্যাগ কর তবে তাদের অল্প সংখ্যকই তা করত(১)। যা করতে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা তা করলে তাদের ভাল হত এবং চিত্তস্থিরতায় তারা দৃঢ়তর হত।

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾

৬৭. আর অবশ্যই তখন আমরা তাদেরকে আমাদের কাছ থেকে মহাপুরস্কার প্রদান করতাম।

وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّآ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾

মস্তিস্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এভাবে স্বীকার করে নেবে যাতে রাসূলের কোন সিদ্ধান্তেই মনে কোন রকম সংকীর্ণতা না থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল হিসেবে গোটা উম্মতের শাসক এবং যে কোন বিবাদের মীমাংসার যিম্মাদার। তার শাসন ও সিদ্ধান্ত অপর কাউকে বিচারক সাব্যস্ত করার উপর নির্ভরশীল নয়। তিনি শুধুমাত্র একজন শাসকই নন, বরং তিনি একজন নিষ্পাপ রাসূল, রাহ্‌মাতুল্লিল ‘আলামীন এবং উম্মতের জন্য একান্ত দয়ালু ব্যক্তিত্ব। কাজেই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যখনই কোন বিষয়ে, কোন সমস্যার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়, তখনই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক সাব্যস্ত করে তার মীমাংসা করিয়ে নেয়া উচিত এবং অতঃপর তাঁর মীমাংসাকে স্বীকার করে নিয়ে সেমতে কাজ করা উভয় পক্ষের উপর ফরয।

মনে রাখতে হবে যে, কুরআনের বাণী ও রাসূলের হাদীসসমূহের উপর আমল করা মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের সাথেই সীমিত নয়। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর পবিত্র শরী‘আতের মীমাংসাই হল তাঁর মীমাংসা। কাজেই এ নির্দেশটি কিয়ামত পর্যন্ত তেমনিভাবেই বলবৎ থাকবে, যেমন ছিল তাঁর যুগে। তখন যেমন সরাসরি কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তকল্পে তাঁর কাছে উপস্থিত করা হত, তেমনি তাঁর পরে তাঁর প্রবর্তিত শরী‘আতের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। এটা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই অনুসরণ।

(১) কাতাদা বলেন, এখানে ইয়াহূদীদেরকেই বলা হচ্ছে। যেমনিভাবে তাদের পুর্বপুরুষদের তাওবা কবুলের জন্য মূসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক তাদের নিজেদের হত্যা করার নির্দেশ ছিল, তেমনি নির্দেশ যদি তাদের জন্যও আসত, তবে তারা তা অবশ্যই অমান্য করত। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

৬৮. এবং অবশ্যই আমরা তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করতাম।

وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٦٨﴾

৬৯. আর কেউ আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবী, সিদ্দীক(১) (সত্যনিষ্ঠ), শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ(২)- যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন- তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী(৩)!

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿٦٩﴾

---

(১) সিদ্দীক বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যে পরম সত্যনিষ্ঠ ও সত্যবাদী। তার মধ্যে সততা ও সত্যপ্রিয়তা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত থাকে। নিজের আচার আচরণ ও লেনদেনে সে হামেশা সুস্পষ্ট ও সরল-সোজা পথ অবলম্বন করে। সে সবসময় সাচ্চাদিলে হক ও ইনসাফের সহযোগী হয়। সত্য ও ন্যায়নীতি বিরোধী যে কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে সে পর্বত সমান অটল অস্তিত্ব নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে সামান্যতম দুর্বলতাও দেখায় না। সে এমনই পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হয় যে, তার আত্মীয়-অনাত্মীয়, বন্ধু-শত্রু, আপন-পর কেউই তার কাছ থেকে নির্লজ্জ ও নিখাদ সত্যপ্রীতি, সত্য-সমর্থন ও সত্য-সহযোগিতা ছাড়া আর কিছুরই আশংকা করে না। কোন রকম দ্বিধা-সংকোচ ও বিরোধিতা তাদের মনে কখনও স্থান পায় না। যেমন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু প্রমূখ।

(২) সালেহীন বা সৎকর্মশীল বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায়, যে তার নিজের চিন্তাধারা, আকীদা-বিশ্বাস, ইচ্ছা, সংকল্প, কথা ও কর্মের মাধ্যমে সত্য-সরল পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এর সাথে নিজের জীবনে সৎ ও সুনীতি অবলম্বন করে। আর যারা প্রকাশ্য ও গোপন সব ক্ষেত্রেই সৎকর্মসমূহের অনুবর্তী।

(৩) জান্নাতের পদমর্যাদাসমূহ আমলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। জান্নাতীদের পদমর্যাদা তাঁদেরই আমল তথা কৃতকর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। প্রথম শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহ্ তা‘আলা নবী-রাসূলগণের সাথে জান্নাতের উচ্চতর স্থানে জায়গা দেবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদেরকে নবীগণের পরবর্তী মর্যাদার লোকদের সাথে স্থান দেবেন। তাদেরকেই বলা হয় সিদ্দীকীন। অতঃপর তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা থাকবেন শহীদগণের সাথে। আর চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা থাকবেন সালেহীনদের সাথে। সারকথা, আল্লাহ্ তা‘আলার আনুগত্যশীল বান্দাগণ সে সমস্ত মহান ব্যক্তিদের সাথে থাকবেন, যাঁরা আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ও মকবুল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ‘জান্নাতবাসীরা নিজেদের জানালা দিয়ে উপরের শ্রেণীর লোকদেরকে তেমনিভাবে দেখতে পাবে, যেমন পৃথিবীতে তোমরা সুদূর দিগন্তে নক্ষত্রকে দেখ। বলা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এরা কি শুধু নবী-রাসূলগণ? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ অবশ্যই না, এমন কিছু

৭০. এগুলো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। সর্বজ্ঞ হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ۝٧٠ ۧ

দশম রুকূ'

৭১. হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন কর; তারপর হয় দলে দলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ۝٧١

লোক যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং নবী-রাসূলদের সত্যায়ন করেছে।' [বুখারীঃ ৩২৫৬, মুসলিমঃ ২৮৩১] তাই যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভে ধন্য হতে চাইবে, তাদেরকে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসার মাধ্যমেই লাভ করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হল যে, 'সে লোকটির মর্যাদা কেমন হবে, যে লোক কোন গোষ্ঠীর ভালবাসা পোষণ করে, কিন্তু আমলের বেলায় এ দলের নির্ধারিত মান পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি?' রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ প্রতিটি লোকই যার সাথে তার ভালবাসা, তার সাথে থাকবে। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, পৃথিবীতে কোন কিছুতেই আমি এতটা আনন্দিত হইনি যতটা এ হাদীসের কারণে আনন্দিত হয়েছি। কারণ, এ হাদীসে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাঁদের গভীর ভালবাসা রয়েছে তাঁরা হাশরের মাঠেও তাঁর সাথেই থাকবেন। [বুখারীঃ ৬১৬৭, মুসলিমঃ ২৬৩৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নিশ্চয় আপনি আমার কাছে আমার নিজের আত্মার চেয়েও প্রিয়। আপনি আমার নিকট আমার পরিবার-পরিজন, সম্পদ, সন্তান-সন্ততিদের থেকেও প্রিয়। আমি আমার ঘরে অবস্থানকালে আপনার কথা স্মরণ হলে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে না দেখি ততক্ষণ স্থির থাকতে পারি না। যখন আমি আমার ও আপনার মৃত্যুর কথা স্মরণ করি তখন বুঝতে পারি যে, আপনি নবীদের সাথে উঁচু স্থানে অবস্থান করবেন। আর আমি যদি জান্নাতে প্রবেশ করি তবে আপনাকে দেখতে না পাওয়ার আশংকা করছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীর কথার তাৎক্ষনিক কোন জওয়াব দিলেন না। শেষ পর্যন্ত জিবরীল আলাইহিস সালাম এ আয়াত নাযিল করলেন।' [আল-মু'জামুস সাগীর লিত তাবরানী ১/২৬; মাজমা'উদ যাওয়ায়িদ ৭/৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি শুনেছিলাম যে, নবীদেরকে মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়া ও আখেরাত যে কোন একটি বেছে নেয়ার অধিকার দেয়া হয়। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অসুস্থতার পর মারা গেলেন, সে অবস্থায় তার মুখ থেকে এ আয়াত শুনতে পেলাম। তখন আমি বুঝলাম যে, তাকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। আর তিনি আখেরাত বেছে নিয়েছেন।" [বুখারী: ৪৪৩৫; মুসলিম: ২৪৪৪]

অথবা একসঙ্গে অগ্রসর হও(১) ।

৭২. আর নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে গড়িমসি করবেই । অতঃপর তোমাদের কোন মুসীবত হলে সে বলবে, ‘তাদের সঙ্গে না থাকায় আল্লাহ্ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন ।’

وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَإِنْ أَصَابَتْكُم
مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ
شَهِيدًا ﴿٧٢﴾

৭৩. আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হলে, যেন তোমাদের ও তার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই এমনভাবে বলবেই, ‘হায়! যদি তাদের সাথে থাকতাম তবে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করতাম(২) ।’

وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن
لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ
مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾

---

(১) আয়াতের প্রথমাংশে জিহাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ এবং আয়াতের দ্বিতীয় অংশে জিহাদে অংশ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে । এতে বেশকিছু শিক্ষা রয়েছে - (১) কোন ব্যাপারে বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয় । (২) অস্ত্র সংগ্রহের নির্দেশ দেয়া হলেও এমন প্রতিশ্রুতি কিন্তু দেয়া হয়নি যে, এ অস্ত্রের কারণে তোমরা নিশ্চিতভাবেই নিরাপদ হতে পারবে । এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করাটা মূলতঃ মানসিক স্বস্তি লাভের জন্যই হয়ে থাকে । (৩) এ আয়াতে প্রথমে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ অতঃপর জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সুশৃংখল নিয়ম বাতলে দেয়া হয়েছে । বলা হয়েছে, তোমরা যখন জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে, তখন একা একা বাহির হবেনা, বরং ছোট ছোট দলে বাহির হবে কিংবা (সম্মিলিত) বড় সৈন্যদল নিয়ে বাহির হবে । তার কারণ, একা একা যুদ্ধ করতে গেলে ক্ষতির আশংকা রয়েছে । শত্রুরা এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে মোটেই শৈথিল্য করে না ।

(২) মুজাহিদ বলেন, এ আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াতে যাদেরকে বলা হয়েছে, তারা হচ্ছে, মুনাফিক । যারা সাহাবাদের সাথে মিশে থাকত । [আত-তাফসীরুস সহীহ] যুদ্ধের ঘোষণা শোনার সথে সাথেই তাদের মধ্যে গড়িমসি শুরু হত । এরপর যদি মুসলিমদের কোন বিপদ হতো, তখন তারা বলত যে, তাদের সাথে না থাকাটা আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আশীর্বাদস্বরূপ । অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ অবস্থায় তারা খুশীও প্রকাশ করত । আল্লাহ্ বলেন, “তোমাদের মঙ্গল হলে তা তাদেরকে কষ্ট দেয় আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা তাতে আনন্দিত হয় ।” [সূরা আলে-ইমরান:১২০]

৭৪. কাজেই যারা আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করুক। আর কেউ আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করলে সে নিহত হোক বা বিজয়ী হোক আমরা তো তাকে মহাপুরস্কার প্রদান করব।

فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ
الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؕ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ٧٤

৭৫. আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা যুদ্ধ করবে না আল্লাহ্‌র পথে এবং অসহায় নরনারী(১) এবং শিশুদের

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ

"আপনার মংগল হলে তা ওদেরকে কষ্ট দেয় এবং আপনার বিপদ ঘটলে ওরা বলে, 'আমরা তো আগেই আমাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম' এবং ওরা উৎফুল্ল চিত্তে সরে পড়ে" [আত-তাওবাহ:৫০] পক্ষান্তরে যখন মুসলিমদের কোন বিজয়ের কথা শুনত, তখন তারা বোল পাল্টিয়ে ফেলত যাতে করে যুদ্ধলব্ধ সম্পদে ভাগ বসাতে পারে। যদিও মুসলিমদের বিজয় তাদের মনের জ্বালা বাড়িয়ে দেয়। [আদওয়াউল বায়ান]

(১) মক্কা নগরীতে এমন কিছু দুর্বল মুসলিম রয়ে গিয়েছিলেন, যারা দৈহিক দুর্বলতা এবং আর্থিক দৈন্যের কারণে হিজরত করতে পারছিলেন না। পরে কাফেররাও তাদেরকে হিজরত করতে বাধাদান করেছিল এবং বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতে আরম্ভ করেছিল, যাতে তারা ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। যেমন ইবন আব্বাস ও তাঁর মাতা, সালামা ইবন হিশাম, ওলীদ ইবন ওলীদ, আবু জান্‌দাল ইবন সাহ্‌ল প্রমূখ। এসব সাহাবী নিজেদের ঈমানী বলিষ্ঠতার দরুন কাফেরদের অসহনীয় উৎপীড়ন সহ্য করেও ঈমানের উপর স্থির থাকেন। অবশ্য তাঁরা এসব অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বরাবরই আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে দো'আ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সে প্রার্থনা মঞ্জুর করে নেন এবং মুসলিমদেরকে নির্দেশ দেন যাতে তাঁরা জিহাদের মাধ্যমে সেই নিপীড়িতদেরকে কাফেরদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন। 'ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি ও আমার মা অসহায়দের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম' [বুখারী: ৪৫৮৭]
এ আয়াতে মুমিনরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দু'টি বিষয়ে দো'আ করেছিলেন। একটি হলো এই যে, আমাদিগকে এই(মক্কা) নগরী থেকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করুন এবং দ্বিতীয়টি হলো, আমাদের জন্য কোন সহায় বা সাহায্যকারী পাঠান। আল্লাহ্ তাঁদের দু'টি প্রার্থনাই কবুল করে নিয়েছিলেন। তা এভাবে যে, কিছু লোককে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, যাতে তাঁদের প্রথম প্রার্থনাটি পূরণ হয়েছিল। অবশ্য কোন কোন লোক সেখানেই

وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا
مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ
لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ
لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ۝٧٥

জন্য, যারা বলে, 'হে আমাদের রব! এ জনপদ---যার অধিবাসী যালিম, তা--- থেকে আমাদেরকে বের করুন; আর আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কাউকে অভিভাবক করুন এবং আপনার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের সহায় করুন ।'

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ
فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ
كَانَ ضَعِيْفًا ۝٧٦

৭৬. যারা মুমিন তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, আর যারা কাফের তারা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে(১) । কাজেই তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল(২) ।

রয়ে যান এবং বিজয়ের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্তাব ইবন উসায়দ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে সেসব লোকের মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন । অতঃপর তিনি এসব উৎপীড়িতদেরকে অত্যাচারীদের উৎপীড়ন-অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন । আর এভাবেই পূর্ণ হয় তাঁদের দ্বিতীয় প্রার্থনাটি । আয়াতে বলা হয়েছে যে, জিহাদের নির্দেশ দানের পিছনে একটি কারণ ছিল সে সমস্ত অসহায় দুর্বল নারী-পুরুষের প্রার্থনা । মুসলিমগণকে জিহাদ করার নির্দেশ দানের মাধ্যমে সে প্রার্থনা মঞ্জুরীর কথাই ঘোষণা করা হয়েছে ।

(১) আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা মুমিন বা ঈমানদার তারা জিহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে । আর যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে শয়তানের পথে । সুতরাং পরিপূর্ণ কোন মুমিন ব্যক্তি যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন তার সামনেই এ উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে যে, আমি আল্লাহ্‌র পথেই এ কাজ করছি । তার নির্দেশ ও নিষেধকে বাস্তবায়নই আমার জীবনের লক্ষ্য । কিন্তু এর বিপরীতে যারা কাফের তাদের বাসনা থাকে কুফরের প্রচলন, কুফরের বিজয় এবং পৈচাশিক শক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করা, যাতে করে বিশ্বময় কুফরী ও শির্কী বিস্তার লাভ করতে পারে । আর কুফরী ও শির্কী যেহেতু শয়তানের পথ, সুতরাং কাফেররা শয়তানের কাজেই সাহায্য করে থাকে ।

(২) আয়াতে বলা হয়েছে যে, শয়তানের চক্রান্ত ও কলাকৌশল হয় দুর্বল । ফলে তা মুমিনের সামান্যতমও ক্ষতি করতে পারে না । অতএব মুসলিমগণকে শয়তানের বন্ধুবর্গ অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে কোন রকম দ্বিধা করা উচিত নয় । তার কারণ, তাদের সাহায্যকারী হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা । পক্ষান্তরে শয়তানের কলাকৌশল কাফেরদের কিছুই মঙ্গল সাধন করবে না । এ আয়াতে শয়তানের

এগারতম রুকূ’

৭৭. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে বলা হয়েছিল, ‘তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর, সালাত কায়েম কর(১) এবং যাকাত দাও(২)?’ অতঃপর যখন তাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেয়া হল তখন তাদের একদল মানুষকে ভয় করছিল আল্লাহকে ভয় করার মত অথবা তারচেয়েও বেশী এবং বলল, ‘হে আমাদের রব! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন দিলেন? আমাদেরকে কিছু দিনের অবকাশ কেন দিলেন না(৩)?’

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓا أَيْدِيَكُمْ
وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَءَاتُوا الزَّكٰوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ
الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ
كَخَشْيَةِ اللّٰهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ
كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلٰٓى أَجَلٍ
قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتٰعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۚ وَالْأٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ
اتَّقٰى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

কলাকৌশলকে যে দুর্বল বলে অভিহিত করা হয়েছে, সেজন্য আয়াতের মাধ্যমেই দু’টি শর্তের বিষয়ও প্রতীয়মান হয়। (এক) যে লোকের বিরুদ্ধে শয়তান কলাকৌশল অবলম্বন করবে, তাকে মুসলিম হতে হবে এবং (দুই) সে যে কাজে নিয়োজিত থাকবে, তা একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র জন্য হতে হবে; কোন পার্থিব বস্তুর আকাঙ্খা কিংবা আত্মস্বার্থ প্রণোদিত হবে না। এ দু’টি শর্তের যেকোন একটির অবর্তমানে শয়তানের কলাকৌশল দুর্বল হয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী নয়।

(১) ইমাম যুহরী বলেন, সালাত কায়েম করার অর্থ, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের প্রত্যেকটিকে তার নির্ধারিত সময়ে আদায় করা। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, আব্দুর রহমান ইবন আউফ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এবং তার কয়েকজন সাথী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমরা যখন মুশরিক ছিলাম তখন আমরা সম্মানিত ছিলাম। কিন্তু যখন ঈমান আনলাম তখন আমাদেরকে অসম্মানিত হতে হচ্ছে। একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ‘আমি ক্ষমা করতে নির্দেশিত হয়েছি, সুতরাং তোমরা যুদ্ধ করো না। তারপর যখন আল্লাহ্ তাকে মদীনায় হিজরত করালেন এবং যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হল তখন তাদের কেউ কেউ যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকল। তখন আল্লাহ্ তা’আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [নাসায়ী: ৩০৮৬; মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৬৭, ৩০৬]

(৩) সুদ্দী বলেন, তারা ‘কিছু দিনের অবকাশ’ বলে মৃত্যু পর্যন্ত সময় চাচ্ছিল। অর্থাৎ তারা যেন বলছে যে, তাদের মৃত্যু হয়ে গেলে তারপর এ আয়াত নাযিল হওয়ার দরকার ছিল। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

বলুন, 'পার্থিব ভোগ সামান্য(১) এবং যে তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য আখেরাতই উত্তম(২)। আর তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হবে না।'

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ
فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا
هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ
فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

৭৮. তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও(৩)। যদি তাদের কোন কল্যাণ হয় তবে তারা বলে, 'এটা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে।' আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয় তবে তারা বলে, 'এটা আপনার কাছ থেকে(৪)।' বলুন, 'সবকিছুই আল্লাহ্‌র

---

(১) হাসান বসরী এ আয়াত পাঠ করে বলেন, ঐ বান্দাকে আল্লাহ্ রহমত করুন, যে দুনিয়াকে এ আয়াত অনুযায়ী সঙ্গী বানিয়েছে। দুনিয়ার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উদাহরণ হচ্ছে, সে ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি ঘুম দিল, ঘুমের মধ্যে সে কিছু ভাল স্বপ্ন দেখল, তারপর তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) আয়াতে দুনিয়ার নেয়ামতের তুলনায় আখেরাতের নেয়ামতসমূহকে উত্তম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে:
দুনিয়ার নেয়ামত অল্প এবং আখেরাতের নেয়ামত অধিক।
দুনিয়ার নেয়ামত ক্ষণস্থায়ী এবং আখেরাতের নেয়ামত অনন্ত-অফুরন্ত।
দুনিয়ার নেয়ামতসমূহের সাথে নানা রকম অস্থিরতাও রয়েছে, কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত এ সমস্ত জঞ্জালমুক্ত।
দুনিয়ার নেয়ামত লাভ অনিশ্চিত, কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত প্রত্যেক মুত্তাকী ব্যক্তির জন্য একান্ত নিশ্চিত। [তাফসীরে কাবীর]

(৩) আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা সুদৃঢ় প্রাসাদে হলেও মৃত্যু তোমাদেরকে বরণ করতেই হবে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, বসবাস করার জন্য কিংবা ধন-সম্পদের হেফাজতের উদ্দেশ্যে সুদৃঢ় ও উত্তম গৃহ নির্মাণ করা তাওয়াক্কুল বা ভরসার পরিপন্থী কিংবা শরী'আত বিরুদ্ধ নয়। [কুরতুবী]

(৪) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এখানে কল্যাণ দ্বারা বদরের যুদ্ধে বিজয় ও গনীমত লাভ বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে অকল্যাণ দ্বারা ওহুদের যুদ্ধে যে বিপদ সংঘটিত হয়েছিল, যাতে রাসূলের চেহারা মুবারকে ক্ষত হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর দাত ভেঙ্গে গিয়েছিল তা বোঝানো হয়েছে। [তাবারী]

কাছ থেকে(১)।’ এ সম্প্রদায়ের কি হল যে, এরা একেবারেই কোন কথা বুঝে না!

مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۫ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ؕ وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿٧٩﴾

৭৯. যাকিছু কল্যাণ আপনার হয় তা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে(২) এবং যাকিছু অকল্যাণ আপনার হয় তা আপনার নিজের কারণে(৩) এবং আপনাকে

---

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, সবকিছুই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়। কিন্তু এর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, ভাল কাজ হলে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, আর মন্দ কাজ হলে তা বান্দার পক্ষ থেকে। এর কারণ হলো আল্লাহ্‌র ইচ্ছা দু‘প্রকার, (এক) সৃষ্টিগত সাধারণ ইচ্ছা, যার সাথে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি থাকা বাধ্যতামূলক নয়। (দুই) শরী‘আতগত বিশেষ ইচ্ছা, যার সাথে সন্তুষ্ট থাকা অবশ্য জরুরী। আলোচ্য এ আয়াতে আল্লাহ্‌র সাধারণ ইচ্ছার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কিছুই হয় না। কিন্তু খারাপ কিছুর ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি থাকে না। তিনি শুধু ভাল কাজেই সন্তুষ্ট হন। খারাপ পরিণতি বান্দার কর্মকাণ্ডের ফল। বান্দা যখন খারাপ কাজ করে তখন আল্লাহ্ তা হতে দেন যদিও তাতে তিনি সন্তুষ্ট হন না। এর বিপরীতে বান্দা যখন ভাল কাজ করেন তখন আল্লাহ্ তা‘আলা তা হতে দেয়ার পাশাপাশি তাতে সন্তুষ্টও হন। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে খারাপ পরিণতির দায়-দায়ীত্ব কেবল বান্দার দিকেই সম্পর্কযুক্ত করা যাবে, আল্লাহ্‌র দিকে সম্পর্কযুক্ত করা জায়েয নেই। [মাজমু‘ ফাতাওয়া ইবন তাইমিয়্যাহ]

(২) আয়াতে ‘হাসানাহ্’-এর দ্বারা নেয়ামতকে বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ যে সমস্ত নেয়ামত লাভ করে তা তাদের প্রাপ্য নয়, বরং একান্ত আল্লাহ্ তা‘আলার অনুগ্রহেই প্রাপ্ত হয়। মানুষ যত ইবাদাত-বন্দেগীই করুক না কেন, তাতে সে কোন নেয়ামত লাভের অধিকারী হতে পারে না। কারণ, ‘ইবাদাত করার যে সামর্থ্য, তাও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই লাভ হয়। তদুপরি আল্লাহ্ তা‘আলার অসংখ্য নেয়ামত তো রয়েছেই। এ সমস্ত নেয়ামত সীমিত ‘ইবাদাত-বন্দেগীর মাধ্যমে কেমন করে সম্ভব? বিশেষ করে আমাদের ‘ইবাদাত-বন্দেগী যদি আল্লাহ্ তা‘আলার শান মোতাবেক না হয়? অতএব, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘আল্লাহ্ তা‘আলার রহমত ব্যতীত কোন একটি লোকও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।’ বলা হল, ‘আপনিও কি যেতে পারবেন না’? তিনি বললেন, ‘না আমিও না’। [বুখারীঃ ৫৩৪৯, মুসলিমঃ ২৮১৬]

(৩) বিপদাপদ যদিও আল্লাহ্ তা‘আলাই সৃষ্টি করেন, কিন্তু তার কারণ হয় মানুষের কৃত অসৎকর্ম। মানুষটি যদি কাফের হয়ে থাকে, তবে তার উপর আপতিত বিপদাপদ তার জন্য সে সমস্ত আযাবের একটা সামান্য নমুনা হয়ে থাকে যা আখেরাতে তার

আমরা মানুষের জন্য রাসূলরূপে পাঠিয়েছি(১); আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট ।

৮০. কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহ্রই আনুগত্য করল(২), আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে আপনাকে তো আমরা তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাই নি ।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى
فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ ٨٠

জন্য নির্ধারিত রয়েছে । বস্তুতঃ আখেরাতের আযাব এর চাইতেও বহুগুণ বেশী । আর যদি লোকটি ঈমানদার হয়, তবে তার উপর আপতিত বিপদাপদ হয় তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, যা আখেরাতে তার মুক্তির কারণ । অথবা তার জন্য পদমর্যাদা বৃদ্ধির সোপান । এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘কোন মুসলিমের উপর যে বিপদই আপতিত হোক না কেন, এর দ্বারা আল্লাহ্ তা‘আলা তার গোনাহের কাফ্ফারা করে দেন । এমনকি যে কাঁটাটি পায়ে ফোটে তাও ।’ [বুখারীঃ ৫৩২৪, মুসলিমঃ ২৫৭২]

(১) আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে । তিনি শুধু আরবদের জন্যই রাসূল ছিলেন না, বরং তাঁর রেসালাত ছিল সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য ব্যাপক । তারা তখন উপস্থিত থাকুক বা না-ই থাকুক । কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষই এর আওতাভুক্ত ।

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের সকল লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে । কিন্তু যে অস্বীকার করেছে (সে জান্নাতবাসী হতে পারবে না) । জিজ্ঞাসা করা হলঃ কে অস্বীকার করেছে, হে রাসূল! উত্তরে বললেনঃ যে আমার অনুসরণ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে । আর যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল না, সে অস্বীকার করল । [বুখারীঃ ৭২৮০] অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ‘যে আমার আনুগত্য করল সে অবশ্যই আল্লাহ্র আনুগত্য করল । আর যে আমার অবাধ্য হলো সে আল্লাহ্র অবাধ্য হল । অনুরূপভাবে যে ক্ষমতাসীনের আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল । আর যে ক্ষমতাসীনের অবাধ্য হলো সে আমার নাফরমানী করলো । ইমাম বা শাসক তো ঢালস্বরূপ, যার পিছনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা যায় এবং যার দ্বারা বাঁচা যায় । যদি ইমাম বা শাসক আল্লাহর তাকওয়ার নির্দেশ দেন এবং ইনসাফ করেন তা হলে সেটা তার জন্য সওয়াবের কাজ হবে । আর যদি অন্য কিছু করেন তবে সেটা তার উপরই বর্তাবে । [বুখারীঃ ২৯৫৭, মুসলিমঃ ১৮৩৫]

৮১. আর তারা বলে, 'আনুগত্য করি'; তারপর যখন তারা আপনার কাছ থেকে চলে যায় তখন রাতে তাদের একদল যা বলে তার বিপরীত পরামর্শ করে। তারা যা রাতে পরামর্শ করে আল্লাহ্ তা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। কাজেই আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন এবং আল্লাহ্র প্রতি ভরসা করুন; আর কাজ উদ্ধারের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট(১)।

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ۖ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۖ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾

৮২. তবে কি তারা কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না? যদি তা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে আসত, তবে তারা এতে অনেক অসঙ্গতি পেত(২)।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

---

(১) মুনাফিকরা যখন আপনার নিকট আসে, তখন বলে যে, আমরা আপনার নির্দেশ কবুল করে নিয়েছি। কিন্তু যখন তারা নাফরমানী করার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় কষ্ট হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেদায়াত দান করছেন যে, এসব বিষয়ে আপনি কোন পরোয়া করবেন না। আপনি আপনার যাবতীয় কাজ আল্লাহ্র উপর ভরসা করে চালিয়ে যেতে থাকুন। কারণ, আপনার জন্য তিনিই যথেষ্ট। এতে প্রতীয়মান হয় যে, যারা মানুষকে হেদায়াতের জন্য দাওয়াত দেবে তাদেরকে নানারকম জটিলতা অতিক্রম করতেই হবে। মানুষ তাদের প্রতি নানারকম উল্টা-সিধা অপবাদ আরোপ করবে। বন্ধুরূপী বহু শত্রুও থাকবে। এসব সত্বেও সে সংকল্প ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে নিজের কাজে নিয়োজিত থাকা উচিত। যদি তার লক্ষ্য ও কর্মপন্থা সঠিক হয়, তবে ইনশাআল্লাহ্ তারা কৃতকার্য হবেই।

(২) পবিত্র কুরআনে কোন একটি বিষয়েও অসংগতি নেই। অতএব, এটা একান্তভাবেই আল্লাহ্র কালাম। মানুষের কালামে এমন অপূর্ব সামঞ্জস্য হতেই পারে না। এর কোথাও না আছে ভাষালঙ্কারের কোন ত্রুটি, না আছে তাওহীদ, কুফর, কিংবা হালাল-হারামের বিবরণে কোন স্ববিরোধিতা ও পার্থক্য। তাছাড়া গায়েবী বিষয়সমূহের মাঝেও এমন কোন সংবাদ নেই, যা প্রকৃত বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তদুপরি না আছে কুরআনের ধারাবাহিকতার কোন পার্থক্য যে, একটি হবে অলঙ্কারপূর্ণ আরেকটি

৮৩. যখন শান্তি বা শংকার কোন সংবাদ তাদের কাছে আসে তখন তারা তা প্রচার করে থাকে(১)। যদি তারা তা রাসূল(২) এবং তাদের মধ্যে যারা নির্দেশ প্রদানের অধিকারী তাদেরকে জানাত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা সেটার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত(৩)। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ

وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِۦ ۖ
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُولِى الْأَمْرِ مِنْهُمْ
لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَٰنَ إِلَّا قَلِيلًا ٨٣

হবে অলঙ্কারহীন। প্রত্যেক মানুষের ভাষা-বিবৃতি ও রচনা-সংকলনে পরিবেশের কমবেশী প্রভাব অবশ্যই থাকে - আনন্দের সময় তা এক ধরণের হয়, আবার বিষাদে হয় অন্যরকম। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হয় এক রকম, আবার অশান্তিপূর্ণ পরিবেশে হয় অন্য রকম। কিন্তু কুরআন এ ধরণের যাবতীয় ত্রুটি, পার্থক্য ও স্ববিরোধিতা থেকে পবিত্র ও উর্ধ্বে। আর এটাই হলো কালামে-ইলাহী হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(১) এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কোন শ্রুত কথা যাচাই, অনুসন্ধান ব্যতিরেকে বর্ণনা করা উচিত নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'কোন লোকের পক্ষে মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কোন রকম যাচাই না করেই সমস্ত শ্রুত কথা প্রচার করে।' [মুসলিম: ৫] অপর এক হাদীসে তিনি বলেছেনঃ 'যে লোক এমন কোন কথা বর্ণনা করে, যার ব্যাপারে সে জানে যে, সেটি মিথ্যা, তাহলে সে দু'জন মিথ্যাবাদীর একজন মিথ্যাবাদী'। [তিরমিযী: ২৬৬২; ইবন মাজাহ: ৩৮; মুসনাদে আহমাদ ৪/২৫৫]

(২) আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে হুকুম-আহকাম উদ্ভাবনের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তার কারণ, আয়াতে দু'রকম লোকের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদের একজন হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অপরজন হচ্ছেন, 'উলুল আমর'। অতঃপর বলা হয়েছে, 'তাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী তাদেরকে জানাত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা সেটার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত'। আর এই নির্দেশটি অত্যন্ত ব্যাপক। রাসূল ও আলেম সমাজ এর আওতাভুক্ত।

(৩) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কুরআন তার একাংশ অপরাংশ দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য নাযিল হয়নি, বরং এর একাংশ অপরাংশের সত্যতা নিরূপন করে। সুতরাং তোমরা এর মধ্যে যা বুঝতে পার তার উপর আমল কর আর যা বুঝতে পারবে না সেটা যারা বুঝে তাদের হাতে ছেড়ে দাও। [ইবন মাজাহঃ ৮৫, মুসনাদে আহমাদ ২/১৮১]

ও রহমত না থাকত তবে তোমাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া সকলে শয়তানের অনুসরণ করত।

فَقَاتِلْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِیْنَ ۚ عَسَی اللّٰهُ اَنْ یَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا ؕ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِیْلًا ﴿۸۴﴾

৮৪. কাজেই আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করুন; আপনি আপনার নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কিছুর যিম্মাদার নন(১) এবং মুমিনগণকে উদ্বুদ্ধ করুন(২), হয়ত আল্লাহ্ কাফেরদের শক্তি সংযত করবেন। আর আল্লাহ্ শক্তিতে প্রবলতর ও শাস্তিদানে কঠোরতর।

مَنْ یَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً یَّكُنْ لَّهٗ نَصِیْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ یَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَیِّئَةً یَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ مُّقِیْتًا ﴿۸۵﴾

৮৫. কেউ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে এবং কেউ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে(৩)।

---

(১) এ আয়াতের প্রথম বাক্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, “আপনি একাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়ুন; কেউ আপনার সাথে থাক বা নাই থাক।” কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যে এ কথাও বলা হয়েছে যে, অন্যান্য মুসলিমদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দানের কাজটিও পরিহার করবেন না। এভাবে উৎসাহ দানের পরেও যদি তারা যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ না হয়, তবে আপনার দায়িত্ব পালিত হয়ে গেল; তাদের কর্মের জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না। এতদসঙ্গে একা যুদ্ধ করতে গিয়ে যেসব বিপদাশংকা দেখা দিতে পারে, তার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে - “আশা করা যায় আল্লাহ্ কাফেরদের যুদ্ধ বন্ধ করে দেবেন এবং তাদেরকে ভীত ও পরাজিত করে দেবেন। আর আপনাকে একাই জয়ী করবেন।” অতঃপর এই বিজয় প্রসঙ্গে প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনার প্রতি যখন আল্লাহ্ তা‘আলার সমর্থন রয়েছে, যার সমর শক্তি কাফেরদের শক্তি অপেক্ষা অসংখ্যগুণ বেশী, তখন আপনার বিজয়ই অবশ্যম্ভাবী। তারপর এই সুদৃঢ় প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় শাস্তির কঠোরতা বর্ণনা করা হয়েছে। এ শাস্তি কিয়ামতের দিনেই হোক, কিংবা পার্থিব জীবনেই হোক, যুদ্ধের ক্ষেত্রে যেমন আমার শক্তি অপরাজেয়, তেমনি শাস্তি দানের ক্ষেত্রেও আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

(২) কিসে উদ্বুদ্ধ করা হবে, তা এ আয়াতে বলা হয় নি। অন্য আয়াতে এসেছে, ‘আর আপনি মুমিনদেরকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করুন’। [সূরা আল-আনফাল:৬৫]

(৩) এ আয়াতে ‘শাফা‘আত’ অর্থাৎ সুপারিশকে ভাল ও মন্দ দু’ভাগে বিভক্ত করার পর

আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপর নজর রাখেন(১) ।

এর স্বরূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক সুপারিশ যেমন মন্দ নয়, তেমনি প্রত্যেক সুপারিশ ভালোও নয় । আরো বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ভালো সুপারিশ করবে, সে সওয়াবের অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ সুপারিশ করবে, সে আযাবের অংশ পাবে । সুতরাং যে ব্যক্তি কারো বৈধ অধিকার ও বৈধ কাজের জন্য বৈধ পন্থায় সুপারিশ করবে, সেও সওয়াবের অংশ পাবে । তেমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন অবৈধ কাজের জন্য অথবা অবৈধ পন্থায় সুপারিশ করবে, সে আযাবের অংশ পাবে । অংশ পাওয়ার অর্থ এই যে, যার কাছে সুপারিশ করা হয়, সে যখন এই উৎপীড়িতের কিংবা বঞ্চিতের কার্যোদ্ধার করে দেবে তখন কার্যোদ্ধারকারী ব্যক্তি যেমন সওয়াব পাবে, তেমনি সুপারিশকারীও সওয়াব পাবে । এমনিভাবে কোন অবৈধ কাজের সুপারিশকারীও গোনাহ্গার হবে । তবে সুপারিশকারীর সওয়াব কিংবা আযাব তার সুপারিশ কার্যকরী ও সফল হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সর্বাবস্থায় সে নিজ অংশ পাবে । রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ‘যে ব্যক্তি কোন সৎকাজে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে, সেও ততটুকু সওয়াব পায়, যতটুকু সৎকর্মী পায় ।’ [মুসলিমঃ ১৮৯৩] এতে জানা গেল যে, সৎকাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা যেমন একটি সৎকাজ তেমনি অসৎ ও পাপ কাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা কিংবা সহযোগিতা প্রদান করা সমান গোনাহ্ । এ সবই হচ্ছে দুনিয়ার সুপারিশের বিষয় । আখেরাতের সুপারিশের আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে ।

(১) আভিধানিক দিক দিয়ে مُقِيْتٌ শব্দের অর্থ তিনটিঃ (এক) শক্তিশালী, সংরক্ষক ও ক্ষমতাবান, (দুই) উপস্থিত ও দর্শক এবং (তিন) রুযী বন্টনকারী । উল্লেখিত বাক্যে তিনটি অর্থই প্রযোজ্য । প্রথম অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের অর্থ হবে- আল্লাহ্ তা‘আলা প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান । যে কাজ করে এবং যে সুপারিশ করে তাদেরকে প্রতিদান কিংবা শাস্তিদান তাঁর পক্ষে কঠিন নয় । দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের অর্থ হবে- আল্লাহ্ তা‘আলা প্রত্যেক বস্তুর পরিদর্শক । কে কোন নিয়তে সুপারিশ করে; আল্লাহ্র ওয়াস্তে মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যার্থে করে, না ঘুষ হিসেবে তার কাছ থেকে কোন মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে করে, তিনি সে সবই জানেন । তৃতীয় অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের মর্ম হবে রিযিক ও রুযী বন্টনের কাজে আল্লাহ্ স্বয়ং যিম্মাদার । যার জন্য যতটুকু লিখে দিয়েছেন, সে ততটুকু অবশ্যই পাবে । কারো সুপারিশে তিনি প্রভাবিত হবেন না; বরং যাকে যতটুকু ইচ্ছা দেবেন । তবে সুপারিশকারী ব্যক্তি মাঝখান থেকে সওয়াব পেয়ে যাবে । কেননা, এটা হচ্ছে দুর্বলের সাহায্য । হাদীসে বলা হয়েছেঃ ‘আল্লাহ্ তা‘আলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য অব্যাহত রাখেন, যতক্ষণ সে কোন মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যে ব্যাপৃত থাকে । তোমরা সুপারিশ কর, সওয়াব পাবে । অতঃপর আল্লাহ্ স্বীয় পয়গম্বরের মাধ্যমে যে ফয়সালা করেন তাতে সন্তুষ্ট থাক ।’ [১৪৩২, মুসলিমঃ ২৬২৭] এ কারণেই কুরআনুল কারীমের

৮৬. আর তোমাদেরকে যখন অভিবাদন করা হয় তখন তোমরাও তার চেয়ে উত্তম প্রত্যাভিবাদন করবে অথবা সেটারই অনুরূপ করবে(১); নিশ্চয়ই আল্লাহ্

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

ভাষায় ইঙ্গিত রয়েছে যে, সুপারিশের সওয়াব ও আযাব সুপারিশ সফল হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং সুপারিশ করলেই সর্বাবস্থায় সওয়াব অথবা আযাব হবে। আপনি ভাল সুপারিশ করলেই সওয়াবের অধিকারী হয়ে যাবেন এবং মন্দ সুপারিশ করলেই আযাবের যোগ্য হয়ে পড়বেন -আপনার সুপারিশ কার্যকরী হোক বা না হোক। তবে অন্যের কাছে সুপারিশ করেই সুপারিশকারী যেন ক্ষান্ত হয়ে যায়, তা গ্রহণ করতে বাধ্য করবে না। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মুক্ত করা বাঁদী বারীরা দাসী অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার পর তার স্বামী মুগীছের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যান। মুগীছ বারীরার ভালবাসায় পাগলপারা হয়ে পড়লে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুগীছকে গ্রহণ করার জন্য বারীরার কাছে সুপারিশ করেন। বারীরা বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এটি আপনার নির্দেশ হলে শিরোধার্য, পক্ষান্তরে সুপারিশ হলে আমার মন তাতে সম্মত নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ নির্দেশ নয়, সুপারিশই। বারীরা জানতেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীতির বাইরে অসন্তুষ্ট হবেন না। তাই পরিস্কার ভাষায় বললেনঃ তাহলে আমি এ সুপারিশ গ্রহণ করবো না। [বুখারীঃ ৪৯৭৯]

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা সালাম ও তার জবাবের আদব বর্ণনা করেছেন। মূলত: ‘আস-সালাম’ শব্দটি আল্লাহ্ তা‘আলার উত্তম নামসমূহের অন্যতম। যার অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তার আধার। বান্দা যখন এ কথা বলে তখন সে তার ভাইয়ের জন্য শান্তি, নিরাপত্তা ও হেফাযত কামনা করে। সে হিসেবে ‘আস-সালামু আলাইকুম’ এর অর্থ, আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদের সংরক্ষক। সালামের উৎপত্তি সম্পর্কে রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ‘আল্লাহ্ তা‘আলা যখন আদম ‘আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করেন তখন তার উচ্চতা ছিল ষাট হাত। আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে সৃষ্টি করে বললেন, যাও, ফেরেশ্তাদের অবস্থানরত দলকে সালাম করো এবং মন দিয়ে শুনবে, তারা তোমার সালামের কি জবাব দেয়। এটাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালাম। সুতরাং আদম ‘আলাইহিস্ সালাম গিয়ে বললেনঃ আসসালামু আলাইকুম। ফেরেশ্তাগণ জবাব দিলেন- ওয়া আলাইকুমুসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ফেরেশ্তাগণ ওয়া রাহমাতুল্লাহ বৃদ্ধি করলেন। তারপর যারা জান্নাতে যাবে তারা প্রত্যেকেই আদম ‘আলাইহিস্ সালাম-এর আকৃতি বিশিষ্ট হবে। তখন থেকে এখন পর্যন্ত মানুষের উচ্চতা ক্রমাগত হ্রাস পেয়েই আসছে। [বুখারীঃ ৬২২৭] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক লোক এসে বললেন, আস্সালামু আলাইকুম, রাসূল তার সালামের জবাব

দিলেন। তারপর লোকটি বসল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ দশ। তারপর আরেকজন এসে বললঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জবাব দিয়ে বললেনঃ বিশ। তারপর আরও একজন এসে বললেনঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জবাব দিয়ে বললেনঃ ত্রিশ। [আবু দাউদঃ ৫১৯৫, তিরমিযীঃ ২৬৮৯]

এখানে এটা জানা আবশ্যক যে, ইসলামী অভিবাদন অন্যান্য জাতির অভিবাদন থেকে উত্তম। জগতের প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যে পারস্পারিক দেখা-সাক্ষাতের সময় ভালবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশার্থে কোন কোন বাক্য আদান-প্রদান করার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু তুলনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামী সালাম যতটুকু ব্যাপক অর্থবোধক, অন্য কোন জাতির অভিবাদন ততটুকু নয়। কেননা, এতে শুধু ভালবাসাই প্রকাশ করা হয় না, বরং সাথে সাথে ভালবাসার যথার্থ হকও আদায় করা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে দো‘আ করা হয় যে, আল্লাহ্ আপনাকে সর্ববিধ বিপদাপদ থেকে নিরাপদে রাখুন। এতে এ বিষয়েরও অভিব্যক্তি রয়েছে যে, আমরা ও তোমরা - সবাই আল্লাহ্ তা‘আলার মুখাপেক্ষী। তাঁর অনুমতি ছাড়া আমরা একে অপরের উপকার করতে পারি না। এ অর্থের দিক দিয়ে বাক্যটি একাধারে একটি ‘ইবাদাত এবং মুসলিম ভাইকে আল্লাহ্‌র কথা মনে করিয়ে দেয়ার উপায়ও বটে। মোট কথা এই যে, ইসলামী সালামে বিরাট অর্থগত ব্যাপ্তি রয়েছে। যথা, (১) এটি আল্লাহ্‌র একটি নাম। তাছাড়া এতে রয়েছে আল্লাহ্ তা‘আলার যিক্‌র, (২) আল্লাহ্‌র কথা মনে করিয়ে দেয়া, (৩) মুসলিম ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না পরস্পরকে ভালবাসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের ঈমান পূর্ণ হবে না। আমি কি তোমাদেরকে একটা বিষয় শিক্ষা দিব, যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে? তোমরা তোমাদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।’ [মুসলিমঃ ৫৪] (৪) মুসলিম ভাইয়ের জন্য সর্বোত্তম দো‘আ এবং (৫) মুসলিম ভাইয়ের সাথে এ চুক্তি যে, আমার হাত ও মুখ দ্বারা আপনার কোন কষ্ট হবে না। সহীহ্ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ‘যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ সে-ই প্রকৃত মুসলিম’। [বুখারী: ১৫; মুসলিম: ৪১] অমুসলিমরা কেউ যদি মুসলিমদেরকে সালাম দেয় তবে তার উত্তরে ‘ওয়া আলাইকুম’ পর্যন্ত বলতে হবে। কারণ, তাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়। যদি সে ভালো উদ্দেশ্যে বলে থাকে, তবে ভালো পাবে, আর যদি খারাপ উদ্দেশ্যে বলে, তবে এটা তার জন্য বদ দো‘আর কাজ করবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘ইয়াহূদীরা যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়, তখন তোমরা প্রত্তোত্তরে ‘ওয়া আলাইকুম’ বা তোমাদের উপরও অনুরূপ

সবকিছুর হিসেব গ্রহণকারী(১)।

৮৭. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রকৃত ইলাহ্ নেই; অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্র করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই।(২) আর আল্লাহ্র চেয়ে বেশী সত্যবাদী কে? (৩)

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ﴿٨٧﴾

বারতম রুকূ’

৮৮. অতঃপর তোমাদের কি হল যে, তোমরা মুনাফেকদের ব্যাপারে দু’দল হয়ে গেলে? যখন আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন(৪)। আল্লাহ্ যাকে

فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿٨٨﴾

হোক এ কথাটি বলবে, কেননা তারা তোমাদের মৃত্যুর দো‘আ করে থাকে। [বুখারী: ৬২৫৭; মুসলিম: ২১৬৪] তাছাড়া সালাম যেহেতু মুসলিমদের একান্ত নিজস্ব ব্যাপার, সেহেতু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য তা প্রয়োগ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে সালাম দিও না; যদি তাদের কারো সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হয়, তবে তাকে সংকীর্ণ পথে চলে যেতে বাধ্য করবে’। [মুসলিম: ২১৬৭]

(১) অর্থাৎ মানুষ এবং ইসলামী অধিকার; যথা সালাম ও সালামের জবাব ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা‘আলা এগুলোরও হিসাব নেবেন।

(২) আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই। তাঁকেই উপাস্য মনে কর এবং যে কাজই কর, তাঁর ‘ইবাদাতের নিয়তে কর। তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্রিত করবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। ঐ দিন সবাইকে প্রতিদান দেবেন। কিয়ামতের ওয়াদা, প্রতিদান ও শাস্তির সওয়াব সব সত্য।

(৩) কেননা এ সংবাদ আল্লাহ্র দেয়া। আল্লাহ্র চাইতে কার কথা সত্য হতে পারে? তিনি নিজে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কোন সত্য ইলাহ নেই। তিনি আরও ঘোষণা করছেন যে, তিনি সবাইকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন। সুতরাং এ তাওহীদ ও আখেরাতের ব্যাপারে কারও মনে কোন প্রকার সন্দেহ থাকা উচিত হবে না।

(৪) যায়েদ ইবন সাবেত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাও? আর আল্লাহ্ কাউকেও পথভ্রষ্ট করলে আপনি তার জন্য কখনো কোন পথ পাবেন না⁽¹⁾ ।

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآءً
فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوا فِي
سَبِيلِ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ
حَيْثُ وَجَدْتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا

৮৯. তারা এটাই কামনা করে যে, তারা যেরূপ কুফরী করেছে তোমরাও সেরূপ কুফরী কর, যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও। কাজেই আল্লাহ্‌র পথে হিজরত⁽²⁾ না করা পর্যন্ত তাদের

ওয়াসাল্লাম যখন ওহুদের যুদ্ধে বের হলেন তখন তার সাথীদের মধ্য থেকে কিছু লোক ফিরে চলে আসলেন। তাদের ব্যাপারে সাহাবাগণ দ্বিমত পোষণ করলেন। কেউ বললেন হত্যা করব, কেউ বললেন হত্যা করব না। তখন এ আয়াত নাযিল হয় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এই মদীনা নগরী কিছু মানুষকে দেশান্তর করে যেমনিভাবে আগুন দূর করে লোহার ময়লাকে। [বুখারীঃ ১৮৮৪, ৪০৫০, ৪৫৮৯, মুসলিমঃ ১৩৮৪, ২৭৭৬]

(১) এ আয়াতে যেভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যাদেরকে আল্লাহ্ তা‘আলা পথভ্রষ্ট করেছেন, তাদের জন্য পথের দিশা পাওয়ার কোন উপায়ই অবশিষ্ট নেই। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা‘আলা তা স্পষ্ট বলেছেন। আল্লাহ্ বলেন, “আর আল্লাহ্ যাকে ফিতনায় ফেলতে চান তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আপনার কিছুই করার নেই। এরাই হচ্ছে তারা যাদের হৃদয়কে আল্লাহ্ বিশুদ্ধ করতে চান না; তাদের জন্য আছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখেরাতে রয়েছে তাদের জন্য মহাশাস্তি।” [সূরা আল-মায়িদাহ: ৪১] অন্য আয়াতে এসেছে, “আল্লাহ্ যাদেরকে বিপথগামী করেন তাদের কোন পথপ্রদর্শক নেই” [সূরা আল-আ‘রাফ: ১৮৬]

(২) হিজরত দু’অর্থে ব্যবহৃত হয়- (১) দ্বীনের খাতিরে দেশ ত্যাগ করা, যেমন সাহাবায়ে কেরাম স্বদেশ মক্কা ছেড়ে মদীনা ও আবিসিনিয়ায় চলে যান। (২) পাপ কাজ বর্জন করা। তন্মধ্যে প্রথম প্রকার হিজরত হচ্ছে নিজের দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য। ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফেরদের দেশ থেকে হিজরত করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয ছিল। এ কারণে যারা এ ফরয পরিত্যাগ করতো, তাদের সাথে আল্লাহ্ তা‘আলা মুসলিমদের মত ব্যবহার করতে নিষেধ করে দেন। হিজরত সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছেঃ ‘যতদিন তাওবা কবুল হওয়ার সময় থাকবে, ততদিন হিজরত বাকী থাকবে’। [আবু দাউদঃ ২৪৭৯] এর দ্বারা বোঝা যায় যে, বর্তমানেও যদি কোন দেশে মুসলিমরা তাদের ঈমান টিকিয়ে রাখতে সামর্থ না হয়, তাদেরকে সেখান থেকে

وَّلَا نَصِيْرًا ۝٨٩

মধ্য থেকে কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদেরকে যেখানে পাবে গ্রেফতার করবে এবং হত্যা করবে আর তাদের মধ্য থেকে কাউকেও বন্ধু ও সহায়রূপে গ্রহণ করবে না।

اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ۝٩٠

৯০. কিন্তু তাদেরকে নয় যারা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ, অথবা যারা তোমাদের কাছে এমন অবস্থায় আগমন করে যখন তাদের মন তোমাদের সাথে বা তাদের সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করতে সংকুচিত হয়। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছে করতেন তবে তাদেরকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতেন ফলে তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। কাজেই তারা যদি তোমাদের কাছ থেকে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব করে তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেন নি।

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ؕ كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ

৯১. তোমরা আরো কিছু লোক অবশ্যই পাবে যারা তোমাদের সাথে ও তাদের সম্প্রদায়ের সাথে শান্তি চাইবে। যখনই তাদেরকে ফিত্‌নার দিকে

হিজরত করতে হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার হিজরত হচ্ছে, পাপকর্ম ত্যাগ করা। যেমন, এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'ঐ ব্যক্তি মুহাজির, যে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন করে।' [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৯৯] এ হিজরত সর্বাবস্থায় একজন মুমিনের কর্তব্য। এর জন্য দেশ ত্যাগের প্রয়োজন পড়ে না।

السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ
وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ۗ وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا
لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿٩١﴾

মনোনিবেশ করানো হয় তখনই এ ব্যাপারে তারা তাদের আগের অবস্থায় ফিরে যায়। যদি তারা তোমাদের কাছ থেকে চলে না যায়, তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব না করে এবং তাদের হস্ত সংবরণ না করে তবে তাদেরকে যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে ও হত্যা করবে। আর আমরা তোমাদেরকে এদের বিরুদ্ধাচারণের স্পষ্ট অধিকার দিয়েছি(১)।

---

(১) উপরোক্ত ৮৮ থেকে ৯১ আয়াতসমূহে তিনটি দলের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে দু'টি বিধান উল্লেখিত হয়েছে। এসব দলের ঘটনাবলী নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাসমূহ থেকে জানা যাবে।

প্রথম বর্ণনাঃ তাফসীরকার মুজাহিদ বলেন, একবার কতিপয় মুশরিক মক্কা থেকে মদীনায় আগমন করে এবং প্রকাশ করে যে, তারা মুসলিম; হিজরত করে মদীনায় এসেছে। কিছুদিন পর তারা দ্বীনত্যাগী হয়ে যায় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পণ্যদ্রব্য আনার অজুহাত পেশ করে পুনরায় মক্কা চলে যায়। এরপর তারা আর ফিরে আসেনি। এদের সম্পর্কে মুসলিমদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয়। কেউ কেউ বলল এরা কাফের, আর কেউ কেউ বলল এরা মুমিন। আল্লাহ্ তা‘আলা ৮৮ ও ৮৯ নং আয়াতে এদের কাফের হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এবং এদেরকে হত্যা করার বিধান দিয়েছেন। [তাবারী] কাতাদা থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এরা ছিল তিহামার একটি গোত্র, তারা রাসূলকে বলল যে, আমরা আপনার সাথে যুদ্ধ করব না, আমাদের কাওমের সাথেও যুদ্ধ করব না। তারা রাসূল ও তাদের কাওমের যুগপৎ নিরাপত্তা চাচ্ছিল। তাদের অবস্থা বুঝে আল্লাহ্ তা‘আলা তা মানতে অস্বীকার করেন। [ইবন আবী হাতেম; আত-তাফসীরুস সহীহ]

দ্বিতীয় বর্ণনাঃ হাসান বসরী বর্ণনা করেন যে, বদর ও ওহুদ যুদ্ধের পর সুরাকা ইবন মালেক মুদলাজী রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা জানালো, আমাদের গোত্র বনী-মুদলাজের সাথে সন্ধি স্থাপন করুন। তিনি খালেদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে সন্ধি সম্পন্ন করার জন্য সেখানে পাঠালেন। সন্ধির বিষয়বস্তু ছিল এইঃ আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবো না। কুরাইশরা মুসলিম হয়ে গেলে আমরাও মুসলিম হয়ে যাবো। যেসব গোত্র আমাদের সাথে একতাবদ্ধ হবে, তারাও এ চুক্তিতে আমাদের অংশীদার। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৯০ নং আয়াত নাযিল হয়।

তেরতম রুকূ’

৯২. কোন মুমিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের কাজ নয়(১), তবে ভুলবশত

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ

তৃতীয় বর্ণনাঃ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, ৯১ নং আয়াতে আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্বয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। তারা মদীনায় এসে বাহ্যতঃ নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করতো এবং স্বগোত্রের কাছে বলতো আমরা তো বানর ও বিচ্ছুদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তারাই আবার মুসলিমদের কাছে বলত, আমরা তোমাদের দ্বীনে আছি।

মোটকথা, এখানে তিন দল লোকের কথা উল্লেখিত হয়েছেঃ এক. মুসলিম হওয়ার জন্য যে সময় হিজরত করা শর্ত সাব্যস্ত হয়, সে সময় সামর্থ্য থাকা সত্বেও যারা হিজরত না করে কিংবা হিজরত করার পর দারুল ইসলাম ত্যাগ করে দারুল হারবে চলে যায়। দুই. যারা স্বয়ং মুসলিমদের সাথে ‘যুদ্ধ নয়’ চুক্তি করে কিংবা এরূপ চুক্তিকারীদের সাথে চুক্তি করে। তিন. যারা সাময়িকভাবে বিপদ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে শান্তিচুক্তি করে অতঃপর মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানানো হলে তাতে অংশগ্রহণ করে এবং চুক্তিতে কায়েম না থাকে।

প্রথম দল সাধারণ কাফেরদের মত। দ্বিতীয় দল হত্যা ও ধরপাকড়ের আওতা বহির্ভুত এবং তৃতীয় দল প্রথম দলের অনুরূপ শাস্তির যোগ্য। এসব আয়াতে মোট দু’টি বিধান উল্লেখিত হয়েছে; অর্থাৎ সন্ধিচুক্তি না থাকা কালে যুদ্ধ এবং সন্ধিচুক্তি থাকাকালে যুদ্ধ নয়।

(১) হত্যা সর্বমোট আট প্রকার। কেননা, নিহত ব্যক্তি হয়তো মুসলিম, কিংবা যিম্মী, অথবা চুক্তিবদ্ধ ও অভয়প্রাপ্ত, নতুবা দারুল হারবের কাফের হবে। এ চার অবস্থার কোন না কোন একটি হবেই। হত্যাকারী দু’প্রকারঃ হয় ইচ্ছাকৃত, না হয় ভুলবশতঃ। অতএব, মোট প্রকার হল আটটিঃ (এক) মুসলিমকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (দুই) মুসলিমকে ভুলবশতঃ হত্যা, (তিন) যিম্মীকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (চার) যিম্মীকে ভুলবশতঃ হত্যা, (পাঁচ) চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (ছয়) চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ভুলবশতঃ হত্যা (সাত) হারবী কাফেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা এবং (আট) হারবী কাফেরকে ভুলবশতঃ হত্যা। প্রথম প্রকারের পার্থিব বিধান হচ্ছে, কিসাস ওয়াজিব হওয়া। যা সূরা বাকারায় উল্লেখ করা হয়েছে [সূরা আল-বাকারাহ: ১৭৮] আর আখেরাতে এর পরিণতি সূরা আন-নিসা এর ৯৩ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ ভুলবশতঃ মুমিনকে হত্যার বর্ণনা আলোচ্য সূরা আন-নিসার ৯২ নং আয়াতে এসেছে। অর্থাৎ দিয়াত দিতে হবে। তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ যিম্মীকে ইচ্ছাকৃত হত্যার হুকুম কি তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। চতুর্থ প্রকার অর্থাৎ যিম্মীকে ভুলবশতঃ হত্যার শাস্তি সূরা আন-নিসার ৯২ নং আয়াতের শেষে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সেটারও দিয়াত দিতে হবে। পঞ্চম প্রকার অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে ইচ্ছাকৃত

مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى
اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ؕ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ؕ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۭ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ
رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ ۫ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٩٢﴾

করলে সেটা স্বতন্ত্র; এবং কেউ কোন মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করলে এক মুমিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ আদায় করা কর্তব্য, যদি না তারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক হয় এবং মুমিন হয় তবে এক মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য। আর যদি সে এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ আদায় এবং মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য। আর যে সঙ্গতিহীন সে একাদিক্রমে দু মাস সিয়াম পালন করবে⁽¹⁾। তাওবাহ্‌র

হত্যা। এর হুকুম সূরা আন-নিসার ৯০ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। মূলতঃ তাদের এবং যিম্মীদের হুকুম একই। কেননা, ৯০ নং আয়াতে উল্লেখিত مِيْثَاقٌ তথা চুক্তি অস্থায়ী ও স্থায়ী উভয় প্রকারই হতে পারে। অতএব, যিম্মী ও অভয়প্রাপ্ত কাফের এর অন্তর্ভুক্ত। সপ্তম ও অষ্টম প্রকারের বিধান স্বয়ং জিহাদ আইনসিদ্ধ হওয়ার মাসআলা থেকে জানা গেছে। কেননা, জিহাদে দারুল হারবের কাফেরদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবেই হত্যা করা হয়। অতএব, ভুলবশতঃ হত্যার বৈধতা আরো সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হবে।

(১) কিসাস ও দিয়াতের বিধান সংশ্লিষ্টতার দিক থেকে হত্যা কয়েক প্রকারঃ প্রথম প্রকার عَمَدٌ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যা। এমন অস্ত্র দ্বারা, যা দ্বারা হত্যা করা যায়। এ ধরনের হত্যার শাস্তি হচ্ছে কিসাস। দ্বিতীয় প্রকার شِبْهُ عَمَدٍ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে যা সাদৃশ্যপূর্ণ। এর সংজ্ঞা এইঃ ইচ্ছা করেই হত্যা করা, কিন্তু এমন অস্ত্র দ্বারা নয়, যা দ্বারা অঙ্গচ্ছেদ হতে পারে। তৃতীয় প্রকার خطأ অর্থাৎ ভুলবশতঃ হত্যা। ইচ্ছা ও ধারণায় ভুল হওয়া। যেমন দূর থেকে মানুষকে শিকারী জন্তু কিংবা দারুল-হারবের কাফের মনে করে লক্ষ্য স্থির করতঃ গুলী করে ফেলা কিংবা লক্ষ্যচ্যুতি ঘটা। যেমন, জন্তুকে লক্ষ্য করেই তীর অথবা গুলী ছোঁড়া; কিন্তু তা কোন মানুষের গায়ে লেগে যাওয়া। এগুলো সব ভুলবশতঃ হত্যার অন্তর্ভুক্ত। এখানে ভুল বলে ‘ইচ্ছা নয়’ বোঝানো হয়েছে। অতএব, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় প্রকার হত্যাই এর অন্তর্ভুক্ত। উভয় প্রকারের মধ্যে গোনাহ্ ও রক্ত-বিনিময় বিভিন্ন রকম। দ্বিতীয় প্রকারের রক্ত-বিনিময় হচ্ছে একশ’ উট। উটগুলো চার প্রকারের হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারে পাঁচটি করে

জন্য এগুলো আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا
وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ۝٩٣

৯৩. আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন(১)।

উট থাকবে। তৃতীয় প্রকারের রক্ত-বিনিময়ও একশ' উট। কিন্তু উটগুলো হবে পাঁচ প্রকারের। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারে বিশটি করে উট থাকবে। তবে রক্ত-বিনিময় মুদ্রার মাধ্যমে দিলে উভয় প্রকারে দশ হাজার দিরহাম অথবা এক হাজার দীনার দিতে হবে। ইচ্ছার কারণে দ্বিতীয় প্রকারের গোনাহ্ বেশী এবং তৃতীয় প্রকারের গোনাহ্ কম। অর্থাৎ শুধু অসাবধানতার গোনাহ্ হবে। কাফ্‌ফারা অর্থাৎ ক্রীতদাস মুক্ত করা কিংবা রোযা রাখা স্বয়ং হত্যাকারীর করণীয় এবং রক্ত-বিনিময় হত্যাকারীর স্বজনদের যিম্মায় ওয়াজিব। শরী'আতের পরিভাষায় তাদেরকে 'আকেলাহ্' বলা হয়। এখানে প্রশ্ন করা উচিত হবে না যে, হত্যাকারীর অপরাধের বোঝা তার স্বজনদের উপর কেন চাপানো হয়? তারা তো নিরপরাধ। এর কারণ এই যে, হত্যাকারীর স্বজনরাও দোষী। তারা তাকে এ ধরণের উচ্ছৃংখল কাজ-কর্মে বাধা দেয়নি। রক্ত-বিনিময়ের ভয়ে ভবিষ্যতে তারা তার দেখাশোনা করতে ত্রুটি করবে না। এর বাইরে অন্য এক প্রকার হত্যা রয়েছে। যাকে কোন কোন ফকীহ ভুলের পর্যায়ভুক্ত বলেছেন। যেমন, কেউ কূপ এমন স্থানে খনন করলো যে, একজন তাতে পড়ে মারা গেল। এর বিধান অবস্থাভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ যখন সূরা আল-ফুরকানের এ আয়াত নাযিল হল "আর তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না। আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে, সে শাস্তি ভোগ করবে।" [আয়াতঃ ৬৮] তখন মক্কার মুশরিকরা বলতে লাগল, আমরা তো আল্লাহ্‌র হারাম করা আত্মাকে হত্যা করেছি, আল্লাহ্‌র সাথে অন্যান্য ইলাহ্‌কেও ডেকেছি এবং ব্যভিচারও করেছি। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন "তারা নয়, যারা তাওবা করে, ঈমান আনে" সুতরাং এই আয়াতটুকু ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যাদের কথা পূর্বে এসেছে। কিন্তু সূরা আন-নিসার আয়াত "কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।" এখানে ঐ লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যে ইসলামকে ভালভাবে জানল, শরী'আতকে বুঝল, তারপর কোন

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰۤى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

৯৪. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে যাত্রা করবে তখন যাচাই-বাছাই করে নেবে(১) এবং কেউ তোমাদেরকে

মুমিনকে হত্যা করল- তার শাস্তি হবে জাহান্নাম। [বুখারীঃ ৩৮৫৫, ৪৭৬৪-৪৭৬৬, মুসলিমঃ ৩০২৩] আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা আরো বলেনঃ এটি সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। একে কোন কিছু রহিত করেনি। [বুখারীঃ ৪৫৯০, মুসলিমঃ ৩০২৩] এতে বুঝা যায় যে, আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার মত হল, যদি কেউ কোন মুমিনকে জেনেশুনে ইচ্ছাকৃত হত্যা করে, তবে তার শাস্তি জাহান্নাম অবধারিত। আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লম বলেছেনঃ একজন মুমিন ব্যক্তি তার দ্বীনের ব্যাপারে মুক্তির সুযোগের মধ্যে থাকে যতক্ষন সে কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে হত্যা না করে। [বুখারীঃ ৬৮৬২] অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনের হত্যাকারীর জন্য তাওবাহ কবুল করতে আমার নিকট অস্বীকার করেছেন'। [আল-আহাদীসুল মুখতারাহঃ ৬/১৬৩, নং-২১৬৪] অন্য হাদীসে এসেছে, আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন দু মুসলিম তাদের অস্ত্র নিয়ে একে অপরের মুখোমুখি হয় তখন হত্যাকারী ব্যক্তি ও হত্যাকৃত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী। আবু বাকরাহ বলেন, আমি বললামঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হত্যাকারীর ব্যাপারটা তো স্পষ্ট, কিন্তু হত্যাকৃত ব্যক্তির কি অপরাধ? তিনি জবাব দিলেন যে, সে তার সাথীকে হত্যা করার লালস করছিল। [বুখারীঃ ৬৮৭৫, মুসলিমঃ ২৮৮৮] হাদীসে আরো এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেয়ামতের দিন প্রথম বিচার অনুষ্ঠিত হবে মানুষের রক্তক্ষরণ তথা হত্যার ব্যাপারে। [বুখারীঃ ৬৮৬৪, মুসলিমঃ ১৬৭৮] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হত্যাকারী কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, হত্যাকৃত ব্যক্তি হত্যাকারীর মাথা ধরে রাখবে এবং বলবেঃ হে রব! আপনি একে প্রশ্ন করুন, কেন আমাকে হত্যা করেছে? [ইবন মাজাহঃ ২৬২১, মুসনাদে আহমাদঃ ১/২৪০]

(১) আয়াতের এ বাক্যে একটি সাধারণ নির্দেশ রয়েছে যে, মুসলিমরা কোন কাজ সত্যাসত্য যাচাই না করে শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে করবে না। বলা হচ্ছে- তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে সফর কর, তখন সত্যাসত্য অনুসন্ধান করে সব কাজ করো। শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করলে প্রায়ই ভুল হয়ে যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিমরূপে পরিচয় দেয়, কালেমা পাঠ করে কিংবা অন্য কোন ইসলামী বৈশিষ্ট্য যথা আযান, সালাত ইত্যাদিতে যোগদান করে, তাকে মুসলিম মনে করা প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। তার সাথে মুসলিমদের মতই ব্যবহার করতে হবে এবং সে আন্তরিকভাবে মুসলিম হয়েছে না কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, একথা প্রমাণ করার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে

সালাম করলে ইহ জীবনের সম্পদের আশায় তাকে বলো না, 'তুমি মুমিন নও(১)', কারণ আল্লাহ্‌র কাছে

تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ

প্রণিধানযোগ্য ও স্মরণযোগ্য যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে, কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী তাকে কাফের বলা বা মনে করা বৈধ নয়। এর সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কুফরের নিশ্চিত লক্ষণ, এরূপ কোন কথা বা কাজ যতক্ষণ তার দ্বারা সংঘটিত না হবে, ততক্ষণ তার ইসলামী স্বীকারোক্তিকে বিশুদ্ধ মনে করা হবে এবং তাকে মুসলিমই বলা হবে। তার সাথে মুসলিমের মতই ব্যবহার করা হবে এবং তার আন্তরিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করার অধিকার কারো থাকবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম ও ঈমান প্রকাশ করার সাথে সাথে কিছু কুফরী কালেমাও উচ্চারণ করে, অথবা প্রতিমাকে প্রণাম করে কিংবা ইসলামের কোন অকাট্য ও স্বতঃসিদ্ধ নির্দেশ অস্বীকার করে কিংবা কাফেরদের কোন ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে; যেমন গলায় পৈতা পরা ইত্যাদি, তাকে সন্দেহাতীতভাবে কুফরী কাজকর্মের কারণে কাফের আখ্যা দেয়া হবে। তবে তাকে এ ব্যাপারে শরী'আতের জ্ঞান দিতে হবে এবং তার যদি এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে, সে সন্দেহ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে হবে। তারপরই কেবল তাকে কাফের বলা যাবে। নতুবা ইয়াহূদী ও খৃষ্টান সবাই নিজেকে মুমিন-মুসলিম বলতো। মুসায়লামা কায্‌যাব শুধু কালেমার স্বীকারোক্তিই নয়, ইসলামী বৈশিষ্ট্য যথা আযান, সালাত ইত্যাদিরও অনুগামী ছিল। আযানে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর সাথে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্'ও উচ্চারণ করতো। কিন্তু সাথে সাথে সে নিজেকেও নবী-রাসূল ও ওহীর অধিকারী বলে দাবী করতো, যা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ। এ কারণেই তাকে দ্বীনত্যাগী সাব্যস্ত করা হয় এবং সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাকে হত্যা করা হয়। তবে শর্ত এই যে, ঐ লোকের কাজটি যে ঈমান বিরোধী, তা অকাট্য ও নিশ্চিত হতে হবে। আর তাকে সেটা জানাতে হবে এবং তার সন্দেহ থাকলে তা শরী'আতের দৃষ্টিতে অপনোদন করতে হবে।

(১) এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কেউ মুসলিম বলে নিজেকে পরিচয় দিলে অনুসন্ধান ব্যতিরেকে তার উক্তিকে কপটতা মনে করা কোন মুসলিমের জন্যই বৈধ নয়। এ ব্যাপারে কোন কোন সাহাবী থেকে ভুল সংঘটিত হওয়ার কারণে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, বনী-সুলাইমের এক ব্যক্তি একদিন ছাগলের পাল চরানো অবস্থায় একদল মুজাহিদ সাহাবীর সম্মুখে পতিত হয়। সে মুজাহিদ দলকে সালাম করল। তার পক্ষ থেকে এ বিষয়ের কার্যতঃ অভিব্যক্তি ছিল যে, সে একজন মুসলিম। কিন্তু মুজাহিদরা মনে করলো যে সে শুধু জীবন ও ছাগলের পাল রক্ষা করার জন্যই এ প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। এ সন্দেহে তাঁরা লোকটিকে হত্যা করে তার ছাগলের পাল অধিকার করে নিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত করলেন।

فَتَبَيَّنُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿٩٤﴾

অনায়াসলভ্য সম্পদ প্রচুর রয়েছে। তোমরা তো আগে এরূপই ছিলে(১), তারপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; কাজেই তোমরা যাচাই-বাছাই করে নেবে। নিশ্চয় তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ
وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۭ
فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى
الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۭ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۭ وَفَضَّلَ

৯৫. মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়(২)। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ্ তাদেরকে, যারা

এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। এতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ইসলামী পদ্ধতিতে তোমাকে সালাম করে, তার সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ করো না যে, সে প্রতারণাপূর্বক নিজেকে মুসলিম বলে প্রকাশ করেছে। তার অর্থ-সম্পদ যুদ্ধলব্ধ মাল মনে করে অধিকারে নিওনা। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/২৩৫, মুসনাদে আহমাদঃ ১/২২৯, ২৭২, ৩২৪, তিরমিযীঃ ৩০৩০]

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে এ দু'টি ঘটনা ছাড়া আরো দু'টি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে, কিন্তু সুবিজ্ঞ তাফসীরবিদগণ বলেছেন, এসব রেওয়ায়েতের মাঝে কোন বিরোধ নেই। সমষ্টিগতভাবে কয়েকটি ঘটনাও আয়াতটি নাযিলের কারণ হতে পারে।

(১) অর্থাৎ তোমাদেরও আগে এমন এক সময় ছিল যখন তোমরা কাফের গোত্রগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলে। যুলুম নির্যাতনের ভয়ে ইসলামের কথা বাধ্য হয়ে গোপন রাখতে। ঈমানের মৌখিক অঙ্গীকার ছাড়া তোমাদের কাছে তার আর কোন প্রমাণ ছিল না। এখন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তোমরা সামাজিক জীবন-যাপনের সুবিধা ভোগ করছ। কাফেরদের মুকাবেলায় ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার যোগ্যতা লাভ করেছ। কাজেই যেসব মুসলিম এখনো প্রথম অবস্থায় আছে তাদের ব্যাপারে কোমল ব্যবহার ও সুবিধা দানের নীতি অবলম্বন না করলে তোমাদেরকে যে অনুগ্রহ করা হয়েছে, তার প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে না।

(২) বারা' ইবন আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ যখন নাযিল হল "মুমিনদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়" তখন আব্দুল্লাহ্ ইবন উম্মে মাকতূম এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি তো অন্ধ। তখন নাযিল হল "যারা অক্ষম নয়"-এ অংশটুকু। [বুখারীঃ ২৮৩১, ৪৫৯৩, মুসলিমঃ ১৮৯৮]

ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন⁽১⁾; তাদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ্ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٩٥﴾

৯৬. এসব তাঁর কাছ থেকে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٩٦﴾

চৌদ্দতম রুকূ’

৯৭. যারা নিজেদের উপর যুলুম করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফিরিশ্‌তাগণ বলে, ‘তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?’ তারা বলে, ‘দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম;’ তারা বলে, ‘আল্লাহ্‌র যমীন কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেখানে তোমরা হিজরত করতে⁽২⁾?’ এদেরই

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿٩٧﴾

---

(১) আবু সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আবু সাঈদ! যে আল্লাহ্‌কে রব হিসাবে মেনে সন্তুষ্ট, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট তার জন্য জান্নাত অবধারিত। আবু সাঈদ এটা শুনে আশ্চার্য হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে আবার বলুন। রাসূল তাই করলেন। তারপর বললেনঃ ‘আরো কিছু কাজ রয়েছে, যার দ্বারা জান্নাতে বান্দার মর্যাদা উন্নত করা হয়, দু’স্তরের মাঝখানের দূরত্ব আসমান ও যমীনের মাঝখানের দূরত্বের মত। তিনি বললেন, সেটা কি? হে আল্লাহ্‌র রাসূল! রাসূল বললেনঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ। [মুসলিমঃ ১৮৮৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘জান্নাতের একশত স্তর রয়েছে, দু’স্তরের মাঝখানের দূরত্ব শত বৎসরের’ [তিরমিযীঃ ২৫২৯]

(২) হিজরত সম্পর্কিত আয়াতসমূহে তিন রকমের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে।

আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত মন্দ আবাস(১)!

اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ
وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا
يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ۙ﴿٩٨﴾

৯৮. তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথও পায় না।

(এক) হিজরতের ফযীলত, (দুই) হিজরতের দুনিয়া ও আখেরাতের বরকত ও (তিন) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দারুল-কুফর থেকে হিজরত না করার কারণে শাস্তিবাণী।

হিজরতের ফযীলতঃ এ বিষয়ে সূরা বাকারার এক আয়াতে রয়েছে- ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾ - অর্থাৎ "যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ-প্রার্থী। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়"। [সূরা আল-বাকারাহ্ঃ ২১৮] অনুরূপভাবে আছে- ﴿اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ﴾ - অর্থাৎ "যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহ্‌র কাছে বিরাট পদমর্যাদার অধিকারী এবং তারাই সফলকাম"। [সূরা আত্-তাওবাহ্ঃ ২০] অন্যত্র এসেছে ﴿وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ﴾ - অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের নিয়তে নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে পথেই মৃত্যুবরণ করে তার সওয়াব আল্লাহ্‌র যিম্মায় সাব্যস্ত হয়ে যায়"। [সূরা আন্-নিসাঃ ১০০] মোটকথা, উপরোক্ত তিনটি আয়াতে দারুল-কুফর থেকে হিজরতে উৎসাহ দান এবং এর বিরাট ফযীলত সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'হিজরত পূর্বকৃত সব গোনাহ্‌কে নিঃশেষ করে দেয়'। [মুসলিম: ১২১; সহীহ ইবন খুযাইমাহ: ২৫১৫]

হিজরতের বরকতঃ হিজরতের বরকত সম্পর্কে সূরা নাহলের ৪১ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ "যারা আল্লাহ্‌র জন্য হিজরত করে নির্যাতিত হওয়ার পর, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা দান করবো এবং আখেরাতের বিরাট সওয়াব তো রয়েছেই, যদি তারা বুঝে।" সূরা নিসার উল্লেখিত চার আয়াতে বলা হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করবে, সে পৃথিবীতে অনেক জায়গা ও সুযোগ-সুবিধা পাবে"।

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ কিছু মুসলিম কাফেরদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অংশগ্রহণ করত। এতেকরে কাফেরদের পাল্লা ভারী হত। কিন্তু যুদ্ধের সময় কোন কোন তীর এসে তাদেরকে হত্যা করত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে তাদেরকে এ অবস্থায় থাকা থেকে নিষেধ করেছেন। [বুখারীঃ ৪৫৯৬, ৭০৮৫]

৯৯. আল্লাহ্ অচিরেই তাদের পাপ মোচন করবেন, কারণ আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল ।

فَأُولَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعۡفُوَ عَنۡهُمۡۚ
وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورٗا ٩٩

১০০. আর কেউ আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করলে সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করবে । আর কেউ আল্লাহ্ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে নিজ ঘর থেকে মুহাজির হয়ে বের হবার পর তার মৃত্যু ঘটলে তার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্‌র উপর; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১] ।

وَمَن يُهَاجِرۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدۡ فِي
ٱلۡأَرۡضِ مُرَٰغَمٗا كَثِيرٗا وَسَعَةٗۚ وَمَن
يَخۡرُجۡ مِنۢ بَيۡتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ
ثُمَّ يُدۡرِكۡهُ ٱلۡمَوۡتُ فَقَدۡ وَقَعَ أَجۡرُهُۥ عَلَى
ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٠٠

পনরতম রুকূ’

১০১. তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফেররা তোমাদের জন্য ফিত্‌না সৃষ্টি করবে, তবে সালাত ‘কসর[২]’ করলে তোমাদের কোন

وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ
جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن
يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْۚ إِنَّ ٱلۡكَٰفِرِينَ كَانُواْ
لَكُمۡ عَدُوّٗا مُّبِينٗا ١٠١

---

(১) বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, হিজরত বাধ্যতামূলক হওয়ার সংবাদ পেয়ে অনেক সাহাবী মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করতে বের হওয়ার পর পথিমধ্যেই বিভিন্ন কারণে মারা যান । এতে কাফেররা তাদেরকে বিভিন্নভাবে উপহাস করতে আরম্ভ করল । তখন আল্লাহ্ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেন, যাতে বলা হয়েছে যে, কেউ খাঁটি নিয়তে আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করতে বের হলেই তার পক্ষ থেকে হিজরত ধরে নেয়া হবে । [দেখুন- মুসনাদে আবি ইয়া‘লাঃ ২৬৭৯] আবার কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, খালেদ ইবন হিযাম আবিসিনিয়ায় হিজরতকালে পথিমধ্যে সর্প-দংশনে মারা যান । তখন লোকেরা তার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে থাকায় এ আয়াত নাযিল হয় । [তাবাকাতে ইবন সা‘দ]

(২) কসর শুধু চার রাকা‘আতের ফরয সালাতের বেলায় হবে । মাগরিব ও ফযরের সালাতে কোন কসর নেই । পূর্ণ সালাতের স্থলে অর্ধেক সালাত আদায় করার ক্ষেত্রে কারো মনে এরূপ ধারণা আনাগোনা করে যে, বোধহয় এতে সালাত পূর্ণ হলো না, এটা ঠিক নয় । কারণ, কসরও শরী‘আতেরই নির্দেশ । এ নির্দেশ পালনে গোনাহ্ হয় না; বরং সওয়াব পাওয়া যায় । ইয়া‘লা ইবন উমাইয়্যা বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাবকে এ আয়াতে বর্ণিত ‘যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফেররা তোমাদের জন্য ফিত্‌না

দোষ নেই। নিশ্চয়ই কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১০২. আর আপনি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন তারপর তাদের সাথে সালাত কায়েম করবেন(১) তখন তাদের একদল আপনার সাথে যেন দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাদের সিজ্‌দা করা হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল যারা সালাতে শরীক হয়নি তারা আপনার সাথে যেন সালাতে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে(২)। কাফেররা

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ
طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمْ ۖ قف
فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ
طَآئِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ
وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ
وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ۗ
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ
أَوْ كُنتُم مَّرْضٰىٓ أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا
حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾

সৃষ্টি করবে' এটা উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করলাম যে, এখন তো মানুষ নিরাপদ হয়েছে তারপরও সালাতের কসর পড়ার কারণ কি? তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি যেটাতে আশ্চার্য হয়েছ, আমিও সেটাতে আশ্চার্যবোধ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'এটা একটি সদকা যেটি আল্লাহ্ তোমাদের উপর সদকা করেছেন, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র সদকা গ্রহণ কর'। [মুসলিমঃ ৬৮৬]

(১) আয়াতে বর্ণিত সালাতটিকে বলা হয়, 'সালাতুল খাওফ' বা ভয়-ভীতিকালীন নামায। এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার 'উসফান' উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন। রাসূল সাহাবাদের নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করতে দেখে কাফেরদের কেউ কেউ বলে বসল যে, এ সময় যদি আক্রমণ করা যেতো তবে তাদেরকে জব্দ করা যেতো। তখন তাদের একজন বলল, এরপর তাদের আরেকটি সালাত রয়েছে, যা তাদের কাছে আরও প্রিয়। অর্থাৎ আসরের সালাত। তখন তাদের কেউ কেউ সে সময়ে মুসলিমদের উপর আক্রমণের ইচ্ছা পোষণ করলে, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে 'সালাতুল খাওফ' পড়ার নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণনা করে দেন। [মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ ২/৪৬৩; মুসান্নাফ আবদির রাযযাক ২/৫০৫; মুসনাদে আহমাদ ৪/৫৯; আবুদাউদ ১২৩৬; নাসায়ীঃ ১৭৭; মুস্তাদরাকে হাকিম ২/৩০৮]

(২) আয়াতে বলা হয়েছেঃ আপনি যখন তাদের মধ্যে থাকেন-এতে এরূপ মনে করার অবকাশ নেই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর এখন 'সালাতুল খওফ'- বা ভয়-ভীতিকালীন নামায- এর বিধান নেই। কেননা, তখনকার

কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও যাতে তারা তোমাদের উপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও বা পীড়িত থাক তবে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন দোষ নেই; কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ্ কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى

১০৩. অতঃপর যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে(১), অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন

অবস্থা অনুযায়ী আয়াতে এ শর্ত বর্ণিত হয়েছে। নবী বিদ্যমান থাকলে ওযর ব্যতীত অন্য কেউ সালাতে ইমাম হতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর এখন যে ইমাম হবেন, তিনিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং 'সালাতুল খওফ' পড়াবেন। সব ফেকাহ্‌বিদের মতে 'সালাতুল খওফ'-এর বিধান এখনো অব্যাহত রয়েছে, রহিত হয়নি। মানুষের পক্ষ থেকে বিপদাশংকার কারণে 'সালাতুল খওফ' পড়া যেমন জায়েয, তেমনিভাবে যদি বাঘ-ভালুক কিংবা অজগর ইত্যাদির ভয় থাকে এবং সালাতের সময়ও সংকীর্ণ হয়, তাহলে তখনো 'সালাতুল খওফ' পড়া জায়েয। আয়াতে উভয় দলের এক এক রাকা'আত পড়ার নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় রাকা'আতের নিয়ম হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকা'আতের পর সালাম ফিরিয়েছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বুখারী: ৯৪২; মুসলিম: ৩০৫, ৩০৬; তিরমিযী: ৩০৩৫; আবু দাউদ: ১২৪২]

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখনই কোন ফরয তার বান্দাদের উপর অবধারিত করে দিয়েছেন তখনই সেটার একটা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তারপর যারা সেটা করতে সক্ষম হবে না তাদেরকে ভিন্ন পথ বাতলে দিয়েছেন। এর ব্যতিক্রম হচ্ছে, 'আল্লাহ্‌র যিকর'। এই যিকর এর ব্যাপারে যতক্ষণ কেউ সুস্থ বিবেকসম্পন্ন থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে ওযর আপত্তি পেশ করার সুযোগ দেন নি। সর্বাবস্থায় তাকে যিকর করতে হবে। রাত-দিন, জল-স্থল, সফর-মুকীম, ধনী-দরিদ্র, সুস্থ-অসুস্থ, গোপন-প্রকাশ্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকর চালিয়ে যেতে হবে। এ আয়াতের এটাই ভাষ্য। [তাবারী, আত-তাফসীরুস সহীহ]

الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴿١٠٣﴾

যথাযথ সালাত কায়েম করবে(১); নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য(২) ।

وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ۭ اِنْ تَكُوْنُوْا
تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ
وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ
عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٠٤﴾

১০৪. আর শত্রু সম্প্রদায়ের সন্ধানে তোমরা হতোদ্যম হয়ো না । যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও তবে তারাও তো তোমাদের মতই যন্ত্রণা পায় এবং আল্লাহ্‌র কাছে তোমরা যা আশা কর ওরা তা আশা করে না(৩) । আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ।

---

(১) মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ যখন তোমরা নিরাপদ হবে এবং স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করবে, তখন পূর্ণরূপ সালাত আদায় করবে । [তাবারী] অর্থাৎ কেউ যেন মনে না করে বসে যে, তাদের সালাত কমে গেছে বা কম পড়লেও চলবে ।

(২) এখানে নির্ধারিত সময় বলে, সালাতের জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যেক সালাতের জন্য নির্ধারিত ওয়াক্তসমূহকে বোঝানো হয়েছে । এখানে সে ওয়াক্তসমূহ বলে দেয়া হয়নি । পক্ষান্তরে অন্য আয়াতে সেগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে । আল্লাহ্ বলেন, “সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করুন এবং ফজরের সালাত । নিশ্চয়ই ফজরের সালাত উপস্থিতির সময়” [সূরা আল-ইসরা: ৭৮] পাশাপাশি হাদীসে সালাতের ওয়াক্তের বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘সালাতের প্রথম ও শেষ সময় রয়েছে । যোহরের সালাতের প্রথম সময় হচ্ছে যখন সূর্য হেলে যাবে । আর শেষ সময় হচ্ছে, আসরের ওয়াক্ত প্রবেশ করা পর্যন্ত । অনুরূপভাবে আসরের প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে, যখন এর ওয়াক্ত হবে । আর তার শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত । তদ্রূপ মাগরিবের প্রথম সময় হচ্ছে যখন সূর্য ডুবে যায় । তার শেষ সময় হচ্ছে, যখন দিগন্ত রেখা চলে যায় । আর এশার প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে, যখন দিগন্ত রেখা চলে যায় । আর শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে, মধ্য রাত পর্যন্ত । ফজরের প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে, যখন সুবহে সাদিক উদিত হয় । আর শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে, যখন সূর্য উদিত হয় ।’ [তিরমিযী: ১৫১]

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে তোমরা সওয়াব, রহমত ও উঁচু মর্যাদা আশা কর, যা তারা করে না । অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, “তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিত ও হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও” [সূরা আলে ইমরান: ১৩৯] আরও বলেন, “কাজেই তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না, যখন তোমরা প্রবল; আর আল্লাহ্ তোমাদের সংগে আছেন এবং তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো ক্ষুণ্ন করবেন না” [সূরা মুহাম্মাদ: ৩৫]

ষোলতম রুকূ’

১০৫. আমরা(১) তো আপনার প্রতি সত্যসহ

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ

---

(১) সূরা আন-নিসার ১০৫ থেকে ১১৩ নং আয়াত এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ঘটনাটি হচ্ছে, হিজরতের প্রাথমিক যুগে সাধারণ মুসলিমদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তাদের সাধারণ খাদ্য ছিল যবের আটা কিংবা খেজুর কিংবা গমের আটা। এগুলো প্রায়ই মদীনায় পাওয়া যেতো না। সিরিয়া থেকে কোন চালান এলে কেউ কেউ তা সংগ্রহ করে রাখত। রিফা‘আ ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ধরনের কিছু গমের আটা সংগ্রহ করে একটি বস্তায় রেখে দিয়েছিলেন। এ বস্তার মধ্যে কিছু অস্ত্র-শস্ত্রও রেখে একটি ছোট কক্ষে সংরক্ষিত রেখেছিলেন। মদীনাতে তখন বনু উবাইরাক গোত্রের বিশর, বশীর ও মুবাশশির নামীয় তিন লোক বিশেষ কারণে খ্যাতি লাভ করেছিল। তন্মধ্যে বশীর ছিল প্রকৃতই মুনাফিক। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে বদনামী করে কবিতা রচনা করে অন্যের নামে চালিয়ে দিত। সেই বশীর সিঁধ কেটে রিফা‘আ ইবন যায়েদের সে বস্তা বের করে নেয়। সকালে রিফা‘আ রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যাপারটি তার ভ্রাতুষ্পুত্র কাতাদার কাছে বিবৃত করলেন। বনু উবায়রাক বললো, সম্ভবত এটা লবীদ ইবন সাহলের কীর্তি। লবীদ ইবন সাহল তা শুনে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন এবং তরবারী কোষমুক্ত করে বললেন, আমার উপর অপবাদ চাপানো হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পন্থায় কাতাদা ও রিফা‘আ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার প্রবল ধারণা জন্মেছিল যে, এটি বনী উবাইরাকের কীর্তি। তখন কাতাদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে চুরির ঘটনা এবং তদন্তক্রমে বনু উবাইরাকের প্রতি প্রবল ধারণার কথা আলোচনা করলেন। বনু উবায়রাক সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে রিফা‘আ ও কাতাদার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, শরী‘আতসম্মত প্রমাণ ছাড়াই তারা আমাদের নামে চুরির অপবাদ আরোপ করছে। আপনি তাদেরকে বারণ করুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই করলেন। কিন্তু বেশীদিন অতিবাহিত না হতেই এ ব্যাপারে বেশ কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। যার মাধ্যমে সমস্ত ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তুলে ধরা হয়। প্রথমে আয়াতে বলা হয়েছে, ‘আমরা তো আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি যাতে আপনি আল্লাহ্ আপনাকে যা জানিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করতে পারেন এবং বিশ্বাসঘাতকদের অর্থাৎ বনী উবাইরাক এর সমর্থনে তর্ক করবেন না।’ আর আপনি ধারণার বশবর্তী হয়ে সাহাবী কাতাদা ইবন নু‘মানকে যা বলা হয়েছে সে জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থী হোন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে তাদের পক্ষে বাদ-বিসম্বাদ করবেন না, নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাস ভংগকারী পাপীকে পছন্দ করেন না। তারা মানুষ থেকে গোপন করতে চায় কিন্তু আল্লাহ্‌র থেকে গোপন করে না, অথচ তিনি তাদের সংগেই আছেন রাতে যখন তারা, তিনি যা পছন্দ করেন না- এমন বিষয়ে পরামর্শ করে এবং তারা যা করে

بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

কিতাব নাযিল করেছি যাতে আপনি আল্লাহ্ আপনাকে যা জানিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করতে পারেন। আর আপনি বিশ্বাসভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করবেন না(১)।

তা সর্বতোভাবে আল্লাহ্‌র জানা রয়েছে। দেখ, তোমরাই ইহ জীবনে তাদের পক্ষে বিতর্ক করছ; কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সম্মুখে কে তাদের পক্ষে বিতর্ক করবে অথবা কে তাদের উকিল হবে? কেউ কোন মন্দ কাজ করে অথবা নিজের প্রতি যুলুম করে পরে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহকে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাবে। অর্থাৎ যদি তারা ক্ষমা প্রার্থী হতো তবে আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের ক্ষমা করে দিতেন। আর কেউ পাপ কাজ করলে সে ওটা তার নিজের ক্ষতির জন্যই করে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। কেউ কোন দোষ বা পাপ করে পরে ওটা কোন নির্দোষ ব্যক্তি অর্থাৎ লবীদ ইবন সাহলের প্রতি আরোপ করলে সে তো মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে। তারপর আল্লাহ্ তা‘আলা রাসূলকে উদ্দেশ্য করে নাযিল করলেন, আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তাদের একদল আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকেও পথভ্রষ্ট করে না এবং আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ্ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং আপনি যা জানতেন না তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র মহা অনুগ্রহ রয়েছে।’ এ আয়াতসমূহ নাযিল হলে মূল ঘটনা স্পষ্ট হয়ে গেল। বনু উবাইরাকের কাছ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রিফা‘আর কাছে তা ফেরৎ দিলেন। তিনি সে সমুদয় আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দিলেন। এদিক বিশর মুনাফেকী অবস্থা ধরা পড়ে যাওয়ার কারণে মক্কায় সুলাফা বিনতে সা‘দ ইবন সুমাইয়া নামীয় এক মহিলার কাছে গিয়ে সরাসরি মুর্তাদ হয়ে গেল। তখন ১১৫ নং আয়াত নাযিল হলো, যাতে হক প্রকাশিত হওয়ার পরে রাসূলের বিরুদ্ধাচারণের কারণে কঠিন শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে।’ [তিরমিযী: ৩০৩৬; মুস্তাদরাকে হাকিম ৪/৩৮৫] ঘটনা যাই হোক, কুরআনের সাধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী এ ব্যাপারে প্রদত্ত নির্দেশাবলী এ ঘটনার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতে আগমনকারী মুসলিমদের জন্য ব্যাপক। এছাড়া এসব নির্দেশের মধ্যে অনেক মৌলিক ও শাখাগত মাসআলাও রয়েছে।

(১) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্‌র কসম অবশ্যই আমি দিনে সত্তর বারেরও অধিক আল্লাহর নিকট এস্তেগফার এবং তাওবা করে থাকি। [বুখারীঃ ৬৩০৭]

১০৬. আর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۚ ﴿١٠٦﴾

১০৭. আর যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে তাদের পক্ষে বিবাদ-বিসম্বাদ করবেন না, নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসভঙ্গকারী পাপীকে পছন্দ করেন না ।

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ۚ ﴿١٠٧﴾

১০৮. তারা মানুষ থেকে গোপন করতে চায় কিন্তু আল্লাহ্‌র থেকে গোপন করে না, অথচ তিনি তাদের সংগেই আছেন রাতে যখন তারা, তিনি যা পছন্দ করেন না- এমন বিষয়ে পরামর্শ করে এবং তারা যা করে আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে আছেন ।

يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ
اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ
الْقَوْلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿١٠٨﴾

১০৯. দেখ, তোমরাই ইহ জীবনে তাদের পক্ষে বিতর্ক করছ; কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সম্মুখে কে তাদের পক্ষে বিতর্ক করবে অথবা কে তাদের উকিল হবে?

هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ۫ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿١٠٩﴾

১১০. আর কেউ কোন মন্দ কাজ করে অথবা নিজের প্রতি যুলুম করে পরে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্‌কে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাবে⁽¹⁾ ।

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ
اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١١٠﴾

---

(১) এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, বান্দার হকের সাথে কিংবা আল্লাহ্‌র হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত সব গোনাহ্ই তাওবা ও ইস্তেগফারের দ্বারা মাফ হতে পারে । তবে তাওবা ও ইস্তেগফারের স্বরূপ জানা জরুরী । শুধু মুখে ‘আস্তাগফিরুল্লাহ্ ওয়া আতুবু ইলাইহি’ বলার নাম তাওবা ও ইস্তেগফার নয় । তাই আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি যদি সে জন্য অনুতপ্ত না হয় এবং তা পরিত্যাগ না করে কিংবা ভবিষ্যতে পরিত্যাগ করতে সংকল্পবদ্ধ না হয়, তবে মুখে মুখে ‘আস্তাগফিরুল্লাহ্’ বলা তাওবার সাথে উপহাস বৈ কিছু নয় । তাওবার জন্য মোটামুটি তিনটি বিষয় জরুরীঃ

১১১. আর কেউ পাপ কাজ করলে সে ওটা তার নিজের ক্ষতির জন্যই করে। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١١﴾

১১২. আর কেউ কোন দোষ বা পাপ করে পরে সেটা কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করলে সে তো মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে⁽১⁾।

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓـَٔةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا
فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿١١٢﴾ ع

সতরতম রুকূ’

১১৩. আর আপনার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তাদের একদল আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকেও পথভ্রষ্ট করে না এবং আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ্ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন⁽২⁾ এবং

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ
طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ
اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ
عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ
تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿١١٣﴾

(এক) অতীত গোনাহ্র জন্য অনুতপ্ত হওয়া, (দুই) উপস্থিত গোনাহ্ অবিলম্বে ত্যাগ করা এবং (তিন) ভবিষ্যতে গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। তাছাড়া বান্দাহ্র হকের সাথে যেসব গোনাহ্র সম্পর্ক, সেগুলো বান্দাহ্র কাছ থেকেই মাফ করিয়ে নেয়া কিংবা হক পরিশোধ করে দেয়া তাওবার অন্যতম শর্ত।

(১) এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, যে লোক নিজে পাপ করে এবং অপর নিরপরাধ ব্যক্তিকে সেজন্য অভিযুক্ত করে, সে নিজ গোনাহ্কে দ্বিগুণ ও অত্যন্ত কঠোর করে দেয় এবং নির্মম শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। একে তো নিজের আসল গোনাহ্র শাস্তি, দ্বিতীয়তঃ অপবাদের কঠোর শাস্তি।

(২) এ আয়াতে ‘কিতাব’-এর সাথে ‘হেকমত’ শব্দটি উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্ ও শিক্ষার নাম যে ‘হেকমত’ তাও আল্লাহ্ তা‘আলারই নাযিলকৃত। পার্থক্য এই যে, সুন্নাহ্র শব্দাবলী আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয়। এ কারণেই তা কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য কুরআন ও সুন্নাহ্ উভয়টিরই তথ্যসমূহ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত। তাই উভয়ের বাস্তবায়নই ওয়াজিব। সে জন্যই আলেমগণ বলেন, ওহী দুই প্রকারঃ (এক) مَتْلُوّ যা তিলাওয়াত করা হয় এবং (দুই) غَيْرُ مَتْلُوّ যা তিলাওয়াত করা হয় না। প্রথম প্রকার ওহী কুরআনকে বলা হয়, যার অর্থ ও শব্দাবলী উভয়ই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। দ্বিতীয় প্রকার

আপনি যা জানতেন না তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র মহা অনুগ্রহ রয়েছে ।

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۭ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١١٤﴾

১১৪. তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে কল্যাণ আছে যে নির্দেশ দেয় সাদকাহ, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের(১); আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় কেউ তা করলে তাকে অবশ্যই আমরা মহা পুরস্কার দেব ।

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿١١٥﴾

১১৫. আর কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে আমরা ফিরিয়ে দেব এবং তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করাব, আর তা কতই না মন্দ আবাস(২)!

ওহী হাদীস বা সুন্নাহ্ । এর শব্দাবলী রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং মর্ম আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে ।

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয় যে মানুষের মধ্যে ভাল কিছু ইশারা করে বা বলে শান্তি স্থাপন করে দেয় । [বুখারীঃ ২৬৯২, মুসলিমঃ ২৬০৫] অন্য হাদীসে এসেছে, আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব না এমন কাজ যা সিয়াম, সালাত ও সদকা থেকেও উত্তম? তারা বললঃ অবশ্যই । রাসূল বললেনঃ মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া । কেননা, মানুষের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হওয়া গর্দান কাটার সমান ।’ [তিরমিযীঃ ২৫০৯]

(২) এ আয়াত থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বের হয় । এক. আল্লাহ্‌র রাসূলের বিরোধিতাকারী জাহান্নামী । দুই. কোন ব্যাপারে হক তথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত প্রকাশিত হওয়ার পর সেটার বিরোধিতা করাও জাহান্নামীদের কাজ । তিন. এ উম্মতের ইজমা বা কোন বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছার পর

আঠারতম রুকূ’

১১৬. নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না; আর তার থেকে ছোট যাবতীয় গোনাহ্ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন, আর যে কেউ আল্লাহ্র সাথে শির্ক করে সে ভীষণভাবে পথ ভ্রষ্ট হয়।	إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾
১১৭. তাঁর পরিবর্তে তারা দেবীরই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে⁽¹⁾।	إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَٰثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَٰنًا مَّرِيدًا ﴿١١٧﴾
১১৮. আল্লাহ্ তাকে লা‘নত করেন এবং সে বলে, ‘আমি অবশ্যই আপনার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী করে নেব।	لَّعَنَهُ ٱللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾
১১৯. আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব; অবশ্যই তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করব, আর অবশ্যই আমি তাদেরকে নির্দেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে। আর অবশ্যই তাদেরকে নির্দেশ দেব, ফলে তারা	وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

সেটার বিরোধিতা করা অবৈধ। কারণ, তারা পথভ্রষ্টতায় একমত হবে না। মুমিনদের মত ও পথের বিপরীতে চলার কোন সুযোগ নেই।

(১) বর্তমান পৃথিবীতে ইয়াযিদী ফের্কা ছাড়া শয়তানকে কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে পূজা করে না বা তাকে সরাসরি আল্লাহ্র মর্যাদায় অভিষিক্ত করে না। এ অর্থে কেউ শয়তানকে মা‘বুদ বানায় না একথা সত্য; তবে নিজের প্রবৃত্তি, ইচ্ছা-আকাংখা ও চিন্তা-ভাবনার লাগাম শয়তানের হাতে তুলে দিয়ে যেদিকে সে চালায় সেদিকেই চলা এবং এমনভাবে চলা যেন সে শয়তানের বান্দা ও শয়তান তার প্রভু- এটাই তো শয়তানকে মা‘বুদ বানাবার একটি পদ্ধতি। এ থেকে জানা যায়, বিনা বাক্য ব্যয়ে নির্দেশ মেনে চলা এবং অন্ধভাবে কারো হুকুম পালন করার নামই ইবাদাত। আর যে ব্যক্তি এভাবে কারো আনুগত্য করে, সে আসলেই তার ইবাদাত করে।

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিকৃত করবে⁽১⁾ ।’ আর আল্লাহ্‌র পরিবর্তে কেউ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করলে সে স্পষ্টতঃই ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾

১২০. সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে। আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনামাত্র ।

أُولٰٓئِكَ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۟ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾

১২১. এদেরই আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, তা থেকে তারা নিস্কৃতির উপায় পাবে না ।

وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾

১২২. আর যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, আমরা তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য । আর কে আল্লাহ্‌র চেয়ে কথায় সত্যবাদী⁽২⁾ ?

---

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা‘আলার লা‘নত করেছেন সে সমস্ত মহিলাদের উপর যারা শরীর কেটে উল্কি আঁকে এবং যারা এ অংকনের কাজ করে, আরো লা‘নত করেছেন যারা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ভ্রূ কাটে এবং যারা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দাঁত কাটে । আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে । [বুখারীঃ ৪৮৮৬] আয়াতে বর্ণিত, ﴿خَلْقَ اللّٰهِ﴾ অর্থ উপরে করা হয়েছে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি । এর আরেক অর্থ, ‘আল্লাহ্‌র দ্বীন’ । যা ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে । [তাবারী] সুতরাং দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার জন্যও শয়তান কিছু লোককে নিয়োজিত করবে ।

(২) বস্তুত: আল্লাহ্‌র কথা বা বাণীর উপর কারও কথা সত্য হতে পারে না । আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সবচেয়ে উত্তম বাণী হচ্ছে, আল্লাহ্‌র কিতাব । আর সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেয়া পদ্ধতি । আর সবচেয়ে খারাপ কাজ হচ্ছে, দ্বীনে প্রবর্তিত নতুন পদ্ধতিসমূহ, আর তোমাদেরকে যার ওয়াদা করা হয়েছে তা অবশ্যই আসবে, তোমরা তাঁকে অপারগ করে দিতে সক্ষম নও ।’ [বুখারী: ৭২৭৭; মুসনাদে আহমাদ ৩/৩১০]

১২৩. তোমাদের খেয়াল-খুশী ও কিতাবীদের খেয়াল-খুশী অনুসারে কাজ হবে না(১); কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবে(২) এবং আল্লাহ্ ছাড়া তার জন্য সে কোন অভিভাবক ও সহায় পাবে না ।

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ۗ
مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٢٣﴾

---

(১) আয়াতে মুসলিম ও আহলে-কিতাবদের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি কথোপকথন উল্লেখিত হয়েছে । এরপর কথোপকথন বিচার করে উভয় পক্ষকে বিশুদ্ধ হেদায়াত দেয়া হয়েছে । অবশেষে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার একটি মানদণ্ড ব্যক্ত করা হয়েছে, যা সামনে রাখলে মানুষ কখনো ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার শিকার হবে না । এতে বলা হয়েছে যে, এ গর্ব ও অহংকার কারো জন্য শোভা পায় না । শুধু কল্পনা, বাসনা ও দাবী দ্বারা কেউ কারো চাইতে শ্রেষ্ঠ হয় না; বরং প্রত্যেকের কাজকর্মই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি । কারো নবী ও গ্রন্থ যতই শ্রেষ্ঠ হোক না কেন, যদি সে ভ্রান্ত কাজ করে, তবে সেই কাজের শাস্তি পাবে । এ শাস্তির কবল থেকে রেহাই দিতে পারে- এরূপ কাউকে সে খুঁজে পাবে না ।

(২) এ আয়াত নাযিল হলে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন । আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ “যে কেউ কোন অসৎকাজ করবে, সে জন্য তাকে শাস্তি দেয়া হবে” । আয়াতটি যখন নাযিল হল, তখন আমরা খুব দুঃখিত ও চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললামঃ এ আয়াতটি তো কোন কিছুই ছাড়েনি । সামান্য মন্দ কাজ হলেও তার সাজা দেয়া হবে । রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ চিন্তা করো না, সাধ্যমত কাজ করে যাও । কেননা, (উল্লেখিত শাস্তি যে জাহান্নামই হবে, তা জরুরী নয়) তোমরা দুনিয়াতে যে কোন কষ্ট বা বিপদাপদে পড়, তাতে তোমাদের গোনাহ্‌র কাফ্‌ফারা এবং মন্দ কাজের শাস্তি হয়ে থাকে । এমনকি যদি কারো পায়ে কাঁটা ফুটে, তাও গোনাহ্‌র কাফ্‌ফারা বৈ নয় ।’ [মুসলিমঃ ২৫৭৪] অন্য এক বর্ণনায় আছে, ‘মুসলিম দুনিয়াতে যে কোন দুঃখ-কষ্ট, অসুখ-বিসুখ অথবা ভাবনা-চিন্তার সম্মুখীন হয়, তা তার গোনাহ্‌র কাফ্‌ফারা হয়ে যায় ।’ [বুখারীঃ ৫৬৪১, মুসলিমঃ ২৫৭৩] অন্য হাদীসে এসেছে, ‘আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাকে কিছু বিপদাপদ দিয়ে থাকেন’ । [বুখারী: ৫৬৪৫] মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলিমদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, শুধু দাবী ও বাসনায় লিপ্ত হয়ো না; বরং কাজের চিন্তা কর । কেননা, তোমরা অমুক নবী কিংবা গ্রন্থের অনুসারী- শুধু এ বিষয় দ্বারাই তোমরা সাফল্য অর্জন করতে পারবে না । বরং এ গ্রন্থের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান এবং তদনুযায়ী সৎকার্য সম্পাদনের মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য নিহিত রয়েছে ।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا (١٢٤)

১২৪. আর পুরুষ বা নারীর মধ্যে কেউ মুমিন অবস্থায় সৎ কাজ করলে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও যুলুম করা হবে না।

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا (١٢٥)

১২৫. তার চেয়ে দ্বীনে আর কে উত্তম যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্‌রাহীমের মিল্লাতকে অনুসরণ করে? আর আল্লাহ্‌ ইব্‌রাহীমকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন(১)।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطًا ۧ (١٢٦)

১২৬. আর আস্‌মান ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই এবং সবকিছুকে আল্লাহ্‌ পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

উনিশতম রুকূ'

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَآءِ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ فِىْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِىْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا (١٢٧)

১২৭. আর লোকে আপনার কাছে নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানতে চায়। বলুন, 'আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা জানাচ্ছেন এবং ইয়াতীম নারী সম্পর্কে যাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না, অথচ তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে চাও(২) এবং অসহায়

---

(১) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মনে রেখ, আমি প্রত্যেক অন্তরঙ্গ বন্ধুর অন্তরঙ্গতা থেকে বিমুক্ত ঘোষণা করছি, যদি আমি কাউকে 'খলীল' বা অন্তরঙ্গ বন্ধু গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। তোমাদের সঙ্গী (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি নিজেই) আল্লাহ্‌র খলীল বা অন্তরঙ্গ বন্ধু। [মুসলিম: ২৩৮৩] মূলত: খলীল বলা হয়, এমন বন্ধুত্বকে যার বন্ধুত্ব অন্তরের অন্তঃস্থলে জায়গা করে নিয়েছে। অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেভাবে আল্লাহ্‌র খলীল, তেমনিভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আল্লাহ্‌র খলীল।

(২) উরওয়া ইবন যুবাইর বলেন, তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তখনকার সময় কারও কারও তত্ত্বাবধানে ইয়াতীম

শিশুদের সম্বন্ধে ও ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায় বিচার সম্পর্কে যা কিতাবে তোমাদেরকে শুনান হয়, তাও পরিস্কারভাবে জানিয়ে দেন’। আর যে কোন সৎকাজ তোমরা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞানী।

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

১২৮. আর কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে তবে তারা আপোস-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন গোনাহ্ নেই এবং আপোস-নিষ্পত্তিই শ্রেয়। মানুষের অন্তরসমূহে লোভজনিত কৃপণতা বিদ্যমান। আর যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও ও মুত্তাকী হও, তবে তোমরা যা কর আল্লাহ্ তো তার খবর রাখেন⁽¹⁾।

মেয়েরা থাকতো। তারা সে সব ইয়াতীম মেয়েদেরকে মাহ্‌র না দিয়েই বিয়ে করতে চাইতো। তখন এ সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হয়। কিন্তু এর বাইরেও কিছু ইয়াতিম থাকতো যাদের সম্পদ ও সৌন্দর্য ছিল না। তারা তাদেরকে বিয়ে করতে চাইতো না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [মুসলিম: ৩০১৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, জাহেলিয়াত যুগে কারও কাছে ইয়াতিম থাকলে সে তার উপর একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিত। যাতে করে অন্যরা তাকে বিয়ে করতে সমর্থ না হয়। তারপর যদি মেয়েটি সুন্দর হতো, তাহলে সে তাকে বিয়ে করত এবং তার সম্পদ নিয়ে নিত। পক্ষান্তরে অসুন্দর হলে সে তাকে আমৃত্যু বিয়ে দিতে বাধা দিত। এভাবে সে তার মৃত্যুর পর তার সম্পদের মালিক বনে যেত। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা সেটা নিষেধ করে দেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেনঃ এ আয়াতটি এমন মহিলা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যে কোন পুরুষের কাছে ছিল কিন্তু তার সন্তান-সন্ততি হওয়ার সম্ভাবনা পেরিয়ে গেছে। ফলে সে তাকে তালাক দিয়ে আরেকটি বিয়ে করতে চাইল। তখন সে মহিলা বলল, আমাকে তালাক দিও না, আমাকে রাত্রির ভাগ দিও না। [বুখারীঃ ৪৬০১, আবু দাউদঃ ২১৩৫] ইবন আব্বাস বলেন, এ জাতীয় মীমাংসা শরী‘আত অনুমোদন করেছে। [তিরমিযী: ৩০৪০] ইবন আব্বাস থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে,

১২৯. আর তোমরা যতই ইচ্ছে কর না | وَلَنۡ تَسۡتَطِيۡعُوۡۤا اَنۡ تَعۡدِلُوۡا بَيۡنَ النِّسَآءِ وَلَوۡ

তিনি এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এ আয়াত সে মহিলার ব্যাপারে, যে কোন লোকের স্ত্রী হিসেবে রয়েছে, সে লোক সাধারণতঃ স্ত্রীর কাছে যা কামনা করে তার কাছে তা দেখতে পায় না। আর সে লোকের অন্য স্ত্রীও রয়েছে। সে লোক অন্য স্ত্রীদেরকে তার উপর প্রাধান্য দিচ্ছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলা সে লোককে নির্দেশ দিচ্ছেন, সে যেন ঐ স্ত্রীকে এটা বলে যে, তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, আমি তোমার উপর অন্যকে প্রাধান্য দিচ্ছি। তারপরও যদি তুমি আমার কাছে থাকতে চাও তবে আমি তোমার খোরপোষ দিব, তোমার সমব্যথী হব, তোমার কোন ক্ষতি হবে না। আর যদি আমার সাথে এ পরিস্থিতিতে থাকতে না চাও, তবে তোমার পথ ছেড়ে দেব। তুমি ইচ্ছা করলে চলে যাবে। এ কথা বলার পর যদি সে মহিলা সেটার উপর রাযি হয়, তবে সে পুরুষের জন্য আর কোন গোনাহ থাকবে না। তাই এখানে যে 'সুলহ' বলা হয়েছে, তার অর্থ হচ্ছে, 'স্ত্রীকে ইখতিয়ার দেয়া'। যার মাধ্যমে মীমাংসার পথ সুগম হয়। পরিবারের সমস্যা দূরিভুত হয়। [তাবারী; ইবন আবী হাতেম; আত-তাফসীরুস সহীহ]

মূলতঃ এ আয়াতটি এমনি সমস্যা সম্পর্কিত, যাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি হয়। নিজ নিজ হিসাবে উভয়ে নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও পারস্পারিক মনের মিল না হওয়ার কারণে উভয়ে নিজ নিজ ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা করে। যেমন একজন সুদর্শন সুঠামদেহী স্বামীর স্ত্রী স্বাস্থ্যহীনা, অধিক বয়স্কা কিংবা সুশ্রী না হওয়ার কারণে তার প্রতি স্বামীর মন আকৃষ্ট হচ্ছে না। আর এর প্রতিকার করাও স্ত্রীর সাধ্যাতীত। এমতাবস্থায় স্ত্রীকেও দোষারোপ করা যায় না, অন্য দিকে স্বামীকেও নিরপরাধ সাব্যস্ত করা যায়। এহেন পরিস্থিতিতে উক্ত স্ত্রীকে বহাল রাখতে চাইলে তার যাবতীয় ন্যায্য অধিকার ও চাহিদা পূরণ করে রাখতে হবে। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে কল্যাণকর ও সৌজন্যমূলক পন্থায় তাকে বিদায় করতে হয়। এমতাবস্থায় স্ত্রীও যদি বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মত হয়, তবে ভদ্রতা ও শালীনতার সাথেই বিচ্ছেদ সম্পন্ন হবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি তার সন্তানের খাতিরে অথবা নিজের অন্য কোন আশ্রয় না থাকার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদে অসম্মত হয়, তবে তার জন্য সঠিক পন্থা এই যে, নিজের প্রাপ্য কোন কোন অধিকারের ন্যায্য দাবী আংশিক বা পুরোপুরি প্রত্যাহার করে স্বামীকে বিবাহ বন্ধন অটুট রাখার জন্য সম্মত করাবে। দায়-দায়িত্ব ও ব্যয়ভার লাঘব হওয়ার কারণে স্বামীও হয়ত এ সমস্ত অধিকার থেকে মুক্ত হতে পেরে এ প্রস্তাব অনুমোদন করবে। এভাবে সমঝোতা হয়ে যেতে পারে। কাজেই স্ত্রী হয়ত মনে করবে যে, আমাকে বিদায় করে দিলে সন্তানাদির জীবন বরবাদ হবে, অথবা অনত্র আমার জীবন আরো দুর্বিসহ হতে পারে। তার চেয়ে বরং এখানে কিছু ত্যাগ স্বীকার করে পড়ে থাকাই লাভজনক। স্বামী হয়ত মনে করবে যে, দায়-দায়িত্ব হতে যখন অনেকটা রেহাই পাওয়া গেল, তখন তাকে বিবাহ বন্ধনে রাখতে ক্ষতি কি? অতএব, এভাবে অনায়াসে সমঝোতা হতে পারে।

حَرَصۡتُمۡ فَلَا تَمِیۡلُوۡا كُلَّ الۡمَیۡلِ فَتَذَرُوۡهَا كَالۡمُعَلَّقَةِ ؕ وَ اِنۡ تُصۡلِحُوۡا وَ تَتَّقُوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوۡرًا رَّحِیۡمًا ﴿۱۲۹﴾

কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনই পারবে না, তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না(১) ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রেখো না; যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

وَ اِنۡ یَّتَفَرَّقَا یُغۡنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنۡ سَعَتِهٖ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِیۡمًا ﴿۱۳۰﴾

১৩০. আর যদি তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায় তবে আল্লাহ্ তাঁর প্রাচুর্য দ্বারা প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করবেন । আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়(২) ।

---

(১) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘যার দু’জন স্ত্রী আছে তারপর সে একজনের প্রতি বেশী ঝুঁকে গেল, কেয়ামতের দিন সে এমনভাবে আসবে যেন তার একপার্শ্ব বাঁকা হয়ে আছে ।’ [আবু দাউদঃ ২১৩৩] তবে আয়াতে যে আদল বা ইনসাফের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, “আর তোমরা যতই ইচ্ছে কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি আদল বা সার্বিক সমান ব্যবহার করতে কখনই পারবে না” সেটা হচ্ছে, ভালবাসা ও স্বাভাবিক মনের টান । কেননা, কোন মানুষই দু’জনকে সবদিক থেকে সমান ভালবাসতে পারে না । তবে শরী‘আত নির্ধারিত অধিকার যেমন, রাত্রী যাপন, সহবাস, খোরপোষ ইত্যাদির ব্যাপারে ‘আদল’ অবশ্যই করা যায় এবং করতে হবে । সেটা না করতে পারলে তাকে একটি বিয়েই করতে হবে । যার কথা এ সূরারই অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, ‘আর যদি তোমরা আদল বা সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে না পার, তবে একটি স্ত্রীতেই সীমাবদ্ধ থাক’ [আদওয়াউল বায়ান] সুতরাং মানসিক টান ও প্রবৃত্তিগত আবেগ কারও প্রতি বেশী থাকাটা আদল বা ইনসাফের বিপরীত নয় । কেননা তা মানবমনের ক্ষমতার বাইরে । [তাবারী]

(২) পূর্বে উল্লেখিত তিনটি আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা মানুষের দাম্পত্য জীবনের এমন একটি জটিল দিক সম্পর্কে পথ-নির্দেশ করেছেন, সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন সময়ে প্রত্যেকটি দম্পতিকেই যার সম্মুখীন হতে হয় । তা হলো স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক মনোমালিন্য ও মন কষাকষি । আর এটি এমন একটি জটিল সমস্যা, যার সুষ্ঠু সমাধান যথাসময়ে না হলে শুধু স্বামী-স্ত্রীর জীবনই দুর্বিসহ হয় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে এহেন পারিবারিক মনোমালিন্যই গোত্র ও বংশগত বিবাদ তথা হানাহানি পর্যন্ত পৌঁছে দেয় । কুরআনুল কারীম নর ও নারীর যাবতীয় অনুভূতি ও প্রেরণার প্রতি

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ

১৩১. আস্‌মানে যা আছে ও যমীনে যা আছে সব আল্লাহ্‌রই(১); তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে

লক্ষ্য রেখে উভয় শ্রেণীকে এমন এক সার্থক পদ্ধতি বাতলে দেয়ার জন্য নাযিল হয়েছে, যার ফলে মানুষের পারিবারিক জীবন সুখী-সমৃদ্ধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এর অনুসরণে পারস্পারিক তিক্ততা ও মর্মপীড়া, ভালবাসা ও প্রশান্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর যদি অনিবার্য কারণে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হয়, তবে তা করা হবে সম্মানজনক ও সৌজন্যমূলক পন্থায় যেন তার পেছনে শক্রতা, বিদ্বেষ ও উৎপীড়নের মনোভাব না থাকে। এ আয়াতে শেষ চিকিৎসা তালাক ও বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার ব্যাপারে হেদায়াত দিয়ে বলা হয়েছে যে, এটা মনে করার কোন সংগত কারণ নেই যে, সার্বিক সমঝোতা সম্ভব না হলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে আল্লাহ্ তাদের উভয়ের প্রতি দয়াশীল হবেন না। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উভয়েরই রব। তিনি তাদের প্রত্যেককেই তাদের প্রয়োজনীয় জীবিকা নির্বাহ করবেন। সুতরাং বিবাহ-বিচ্ছেদ পদ্ধতির ব্যাপারে কারও আপত্তি করা উচিত নয়।

মোটকথা, কুরআনুল কারীম উভয় পক্ষকে একদিকে স্বীয় অভাব অভিযোগ দূর করা ও ন্যায্য অধিকার লাভ করার আইনতঃ অধিকার দিয়েছে। অপরদিকে ত্যাগ, ধৈর্য, সংযম ও উন্নত চরিত্র আয়ত্ব করার উপদেশ দিয়েছে। এখানে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, বিবাহ বিচ্ছেদ হতে যথাসাধ্য বিরত থাকা কর্তব্য। বরং উভয় পক্ষেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করে সমঝোতায় আসা বাঞ্ছনীয়। তারপরও যদি বিচ্ছেদ হয়ে যায়, তবে জীবন সম্পর্কে হতাশ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্ প্রত্যেককেই তাঁর রহমতে স্থান দিবেন।

(১) অর্থাৎ আসমান ও জমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্ তা'আলার। এখানে এই উক্তিটির তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। প্রথমবার বোঝানো হয়েছে, আল্লাহ্‌র সচ্ছলতা, প্রাচুর্য ও তাঁর দরবারে অভাবহীনতা। তিনি অভাবীর কথা শুনেন ও অভাব দুর করবেন। কারও অভাব তাঁর অজানা নয়। তিনিই সবাইকে তার আরাধ্য বিষয় দিতে সামর্থ। দ্বিতীয়বার বোঝানো হয়েছে যে, কারো অবাধ্যতায় আল্লাহ্ তা'আলার কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। তৃতীয়বার আল্লাহ্ তা'আলার অপার রহমত ও সহায়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যদি আল্লাহ্‌ভীতি ও আনুগত্য কর, তবে তিনি তোমাদের সব কাজে সহযোগিতা করবেন, এবং অনায়াসে তা সু-সম্পন্ন করে দেবেন। তৃতীয় আয়াতে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অপরিসীম ক্ষমতাবান। তিনি ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে সবকিছু পরিবর্তন করে দিতে পারেন। তোমাদের সবাইকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে তোমাদের স্থলে অন্যদেরকে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম। অবাধ্যদের পরিবর্তে তিনি অনুগত ও বাধ্য লোক অনায়াসে সৃষ্টি করতে পারেন। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও অনির্ভরতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে এবং অবাধ্যদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর(১) । আর তোমরা কুফরী করলেও আস্‌মানে যা আছে ও যমীনে যা আছে তা সবই আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসাভাজন ।

اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿١٣١﴾

১৩২. আস্‌মানে যা আছে ও যমীনে যা আছে সব আল্লাহ্‌রই এবং কার্যোদ্ধারে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট ।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٣٢﴾

১৩৩. হে মানুষ! তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে অপসারিত করতে ও অপরকে আনতে পারেন(২); আর

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿١٣٣﴾

---

(১) এ আয়াত মানবজাতির জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ ওসিয়্যত । আগের ও পরের যাবতীয় মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ওসিয়ত । যার বড় আর কোন অসিয়্যত হতে পারে না । বিভিন্ন নবী-রাসূলগণও যুগে যুগে তাদের উম্মতদেরকে এ ওসিয়ত করেছেন । এমনকি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও তার কাছে কেউ ওসিয়্যতের অনুরোধ জানালে এ ওসিয়্যতটি প্রথমে করতেন । হাদীসে এসেছে, এক লোক এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ওসিয়্যত চাইলে তিনি বললেন, 'তোমার কর্তব্য হবে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করা । আর তুমি প্রতিটি উঁচুস্থানে উঠা বা উল্লেখযোগ্য স্থানে তাকবীর বা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা ।' [তিরমিযী: ৩৪৪৫; মুসনাদে আহমাদ ৩/৩৩৩] তাছাড়া যখনই কোন সেনাদল পাঠাতেন, তাদেরকে তাকওয়ার ওসিয়্যত করতেন । [মুসলিম ১৭৩১; আবু দাউদ: ২৬১২]

(২) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ওহী নাযিল হওয়ার সময়ে যারা ছিল তাদেরকে নিয়ে গিয়ে তাদের স্থলে অন্যদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন । অন্য আয়াতে তিনি যে অন্য কাউকে এনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন সেটার প্রমাণও উল্লেখ করা হয়েছে । বলা হয়েছে, "তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে অপসারিত করতে এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছে তোমাদের স্থানে আনতে পারেন, যেমন তোমাদেরকে তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ থেকে সৃষ্টি করেছেন" [সূরা আল-আন'আম: ১৩৩] অন্য আয়াতে এটাও বলা হয়েছে যে, যাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হবে, তারা তাদের মতো হবে না, বরং তাদের চেয়ে ভালো হবে । বলা হয়েছে, "আর যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারপর তারা তোমাদের মত হবে না" [সূরা মুহাম্মাদ: ৩৮] অন্য আয়াতে এ কাজটিকে

আল্লাহ্ তা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

১৩৪. কেউ দুনিয়ার পুরস্কার চাইলে তবে (সে যেন জেনে নেয় যে) দুনিয়া ও আখেরাতের পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে(১)। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ
ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾ ع

বিশতম রুকূ’

১৩৫. হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক বা বিত্তহীন হোক আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্টতর। কাজেই তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল বা পাশ কাটিয়ে যাও তবে তোমরা যা কর আল্লাহ্ তো তার সম্যক খবর রাখেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا كُونُوا قَوّٰمِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْاَقْرَبِينَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى
بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰۤى اَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَاِنْ تَلْوٗۤا
اَوْ تُعْرِضُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

১৩৬. হে মুমিনগণ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, এবং সে কিতাবের প্রতি যা আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন। আর সে গ্রন্থের প্রতিও যা তার পূর্বে

يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوۤا اٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهٖ وَالْكِتٰبِ
الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُولِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْۤ اَنْزَلَ مِنْ
قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

তাঁর জন্য অত্যন্ত সহজ বলে ঘোষণাও করেছেন। তিনি বলেন, “তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে অপসৃত করতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন। আর এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে কঠিন নয়” [সূরা ইবরাহীম: ১৯; সূরা ফাতির: ১৬]।

(১) এ আয়াতদৃষ্টে মনে হতে পারে যে, দুনিয়ার পুরস্কার চাইলেই তাকে তা দেয়া হবে। মূলত: অন্য আয়াতে সেটাকে শর্তযুক্ত করে বলা হয়েছে যে, “যে দুনিয়া চায়, তাকে আমি দুনিয়াতে যা ইচ্ছা করি যতটুকু ইচ্ছা করি প্রদান করি” [সূরা আল-ইসরা: ১৮] সুতরাং দুনিয়া চাইলেই পাবে, তা কিন্তু নয়। যাকে যতটুকু দেয়ার ইচ্ছা আল্লাহ্‌র হবে, ততটুকুই সে পাবে। এর বাইরে নয়।

তিনি নাযিল করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও শেষ দিবসের প্রতি কুফরী করে(১) সে সুদূর বিভ্রান্তিতে পতিত হলো।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ
ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ
سَبِيْلًا ۭ﴿١٣٧﴾

১৩৭. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও পরে কুফরী করে এবং আবার ঈমান আনে, আবার কুফরী করে, তারপর তাদের কুফরী প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ্‌ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোন পথ দেখাবেন না(২)।

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ﴿١٣٨﴾

১৩৮. মুনাফিকদেরকে শুভ সংবাদ দিন যে, তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে।

الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاۗءَ مِنْ دُوْنِ
الْمُؤْمِنِيْنَ ۭ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ

১৩৯. মুমিনগণের পরিবর্তে যারা কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি ওদের কাছে ইয্‌যত চায়?

---

(১) কুফরী করার দু'টি অর্থ হয়। (এক) সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অস্বীকার করা। (দুই) মুখে মেনে নেয়া কিন্তু মনে মনে অস্বীকার করা। অথবা নিজের মনের ভাবের মাধ্যমে একথা প্রমাণ করা যে, সে যে জিনিষটি মেনে নেয়ার দাবী করছে আসলে সেটিকে মানে না। এখানে কুফরী শব্দটি দু'টি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

(২) এ আয়াতের তাৎপর্য এই যে, বার বার কুফরীর মধ্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে সত্যকে উপলব্ধি করার এবং গ্রহণ করার যোগ্যতা রহিত হয়ে যায়। ভবিষ্যতে তাওবা করা ও ঈমান আনার সৌভাগ্য হয় না। তবে কুরআন-হাদীসের অকাট্য দলীলাদির দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যত বড় কট্টর কাফের বা মুরতাদই হোক না কেন, যদি সত্যিকারভাবে তাওবা করে, তবে পূর্ববর্তী সমুদয় গোনাহ্‌ মাফ হয়ে যায়। অতএব, বার বার কুফরী করার পরও যদি তারা সত্যিকারভাবে তাওবা করে, তবে তাদের জন্য এখনো ক্ষমার আইন উন্মুক্ত রয়েছে। এখানে তাওবাহ কবুল না করার অর্থ এই যে, তারা কোন কোন গোনাহ থেকে তাওবা করলেও মূল গোনাহ অর্থাৎ শির্ক ও কুফর থেকে তাওবাহ করতে সমর্থ হয় না। সুতরাং তাদের তাওবাহ গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

সমস্ত ইয্‌যত তো আল্লাহ্‌রই(১) ।

১৪০. কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি তো নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহ্‌র আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে

لِلّٰهِ جَمِيۡعًا ۝١٣٩

وَقَدۡ نَزَّلَ عَلَيۡكُمۡ فِي الۡكِتٰبِ اَنۡ اِذَا سَمِعۡتُمۡ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكۡفَرُ بِهَا وَيُسۡتَهۡزَاُ بِهَا فَلَا تَقۡعُدُوۡا مَعَهُمۡ حَتّٰى يَخُوۡضُوۡا فِيۡ حَدِيۡثٍ غَيۡرِهٖۤ ۖ اِنَّكُمۡ اِذًا مِّثۡلُهُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الۡمُنٰفِقِيۡنَ

---

(১) এ আয়াতে কাফের ও মুশরিকদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য স্থাপন করাকে নিষিদ্ধ করে এ ধরণের আচরণে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। সাথে সাথে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার উৎস ও মূল কারণ বর্ণনা করে একেও অযথা অবান্তর প্রতিপন্ন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছেঃ “তারা কি ওদের কাছে গিয়ে ইজ্জত-সম্মান লাভ করতে চায়? তবে ইজ্জত-সম্মানতো সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌রই মালিকানাধীন।” কাফের ও মুশরিকদের সাথে সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা এবং অন্তরঙ্গ মেলা-মেশার প্রধান কারণ এই যে, তাদের বাহ্যিক মানমর্যাদা, শক্তি-সামর্থ্য, ধনবলে প্রভাবিত হয়ে হীনমন্যতার শিকার হয় এবং মনে করে যে, তাদের সাহায্য-সহযোগিতায় আমাদেরও মানমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে বলেন যে, তারা এমন লোকদের সাহায্যে মর্যাদাবান হওয়ার আকাংখা করছে, যাদের নিজেদেরই সত্যিকারের কোন মর্যাদা নেই। তাছাড়া যে শক্তি ও বিজয়ের মধ্যে সত্যিকারের ইজ্জত ও সম্মান নিহিত, তা তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই মালিকানাধীন। অন্য কারো মধ্যে যখন কোন ক্ষমতা বা সাফল্য পরিদৃষ্ট হয়, তা সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত। অতএব, মানমর্যাদা দানকারী মালিককে অসন্তুষ্ট করে তাঁর শত্রুদের থেকে ইজ্জত হাসিল করার অপচেষ্টা কত বড় বোকামী। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, “আর ইজ্জত-সম্মান একমাত্র আল্লাহ্, রাসূল এবং ঈমানদারদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু মুনাফেকরা তা অবগত নয়।” [সূরা আল-মুনাফিকুন:৮] এখানে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদের উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি যাকে ইচ্ছা আংশিক মর্যাদা দান করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনগণ যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অনুগত, পছন্দনীয় ও প্রিয়পাত্র, তাই তিনি তাঁদেরকে সম্মান দান করেন। পক্ষান্তরে কাফের ও মুশরিকদের ভাগ্যে সত্যিকার কোন ইজ্জত নেই। অতএব, তাদের সাথে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন করে সম্মান অর্জন করা সুদূর পরাহত। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি বান্দাদের (মাখলুকের) মর্যাদাবান হওয়ার বাসনা করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে লাঞ্ছিত করেন।' [বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান: ৭৪২১] সুতরাং আয়াতের মর্ম এই যে, কাফের, মুশরিক, পাপিষ্ঠ ও পথভ্রষ্টদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জনের ব্যর্থ চেষ্টা করা অন্যায় ও অপরাধ।

وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۙ﴿١٤٠﴾

লিপ্ত না হবে তোমরা তাদের সাথে বসো না(১), নয়তো তোমরাও তাদের মত হবে(২)। মুনাফিক এবং কাফের সবাইকে আল্লাহ্ তো জাহান্নামে একত্র করবেন।

اِلَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ
اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ
نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ
مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۭ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ وَلَنْ
يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۧ﴿١٤١﴾

১৪১. যারা তোমাদের অমঙ্গলের প্রতীক্ষায় থাকে, তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের জয় হলে বলে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না।' আর যদি কাফেরদের কিছু বিজয় হয়, তবে তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রবল ছিলাম না এবং আমরা কি তোমাদেরকে মুমিনদের হাত থেকে

---

(১) এ আয়াতের মর্ম এই যে, যদি কোন প্রভাবে কতিপয় লোক একত্রিত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কোন আয়াত বা হুকুমকে অস্বীকার বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে, তবে যতক্ষণ তারা এহেন গর্হিত ও অবাঞ্ছিত কাজে লিপ্ত থাকবে, ততক্ষণ তাদের মজলিশে বসা বা যোগদান করা মুসলিমদের জন্য হারাম। বাতিলপন্থীদের মজলিশে উপস্থিত ও তার হুকুম কয়েক প্রকার। প্রথমতঃ তাদের কুফরী চিন্তাধারার প্রতি সম্মতি ও সন্তুষ্টি সহকারে যোগদান করা। এটা মারাত্মক অপরাধ ও কুফরী। দ্বিতীয়তঃ গর্হিত আলোচনা চলাকালে বিনা প্রয়োজনে অপছন্দ সহকারে উপবেশন করা। এটা অত্যন্ত অন্যায় ও ফাসেকী। তৃতীয়তঃ পার্থিব প্রয়োজনবশতঃ বিরক্তি সহকারে বসা জায়েয। চতুর্থতঃ জোর-জবরদস্তির কারণে বাধ্য হয়ে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বসা ক্ষমার যোগ্য। পঞ্চমতঃ তাদের সৎপথে আনয়নের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হওয়া সওয়াবের কাজ।

(২) আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, এমন মজলিশ যেখানে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত ও আহকামকে অস্বীকার, বিদ্রূপ বা বিকৃত করা হয়, সেখানে হৃষ্টচিত্তে উপবেশন করলে তোমরাও তাদের সমতুল্য ও তাদের গোনাহ্‌র অংশীদার হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ না করুন, তোমরা যদি তাদের কুফরী কথা-বার্তা মনে প্রাণে পছন্দ কর, তাহলে বস্তুতঃ তোমরাও কাফের হয়ে যাবে। কেননা, কুফরী পছন্দ করাও কুফরী। আর যদি তাদের কথা-বার্তা পছন্দ না করা সত্ত্বেও বিনা প্রয়োজনে তাদের সাথে উঠাবসা কর এমতাবস্থায় তাদের সমতুল্য হবার অর্থ হবে তারা যেভাবে শরী'আতকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি সাধন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে, তোমরা তাদের আসরে যোগদান করে সহযোগিতা করায় তাদের মতই ইসলামের ক্ষতি সাধন করছ।

রক্ষা করিনি(১)?' আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করবেন এবং আল্লাহ্ কখনই মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোন পথ রাখবেন না(২) ।

একুশতম রুকূ'

১৪২. নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহ্র সাথে ধোঁকাবাজি করে; বস্তুতঃ তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেন(৩) । আর

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ

---

(১) এটিই প্রত্যেক যুগের মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য । মৌখিক স্বীকারোক্তি ও ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে নামমাত্র প্রবেশের মাধ্যমে মুসলিম হিসাবে যতটুকু স্বার্থ ভোগ করা যায় তা তারা ভোগ করে । আবার অন্যদিকে কাফের হিসাবে যে স্বার্থটুকু ভোগ করা সম্ভব তা ভোগ করার জন্য তারা কাফেরদের সাথে যোগ দেয় । তাদেরকে বলেঃ আমরা মোটেই গোঁড়া বা প্রতিক্রিয়াশীল অথবা মৌলবাদী-বিদ্বেষপরায়ণ মুসলিম নই । মুসলিমদের সাথে আমাদের নামের সম্পর্ক আছে কিন্তু আমাদের মানসিক ঝোঁক, আগ্রহ ও বিশ্বস্ততা রয়েছে তোমাদের প্রতি । চিন্তা-ভাবনা, আচার-ব্যবহার, রুচি-প্রকৃতি ইত্যাদি সবদিক দিয়ে তোমাদের সাথে আমাদের গভীর মিল । তাছাড়া ইসলাম ও কুফরীর সংঘর্ষে আমরা তোমাদের পক্ষই অবলম্বন করব ।

(২) এ আয়াতের অর্থ এ নয় যে, দুনিয়াতে কোন কাফের ঈমানদারদের উপর বিজয়ী হবে না । কারণ, এটার মূলকথা আখেরাতের সাথে সম্পৃক্ত । আয়াতের শুরুতেই 'কিয়ামতের দিন' উল্লেখ করার মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এক লোক এসে বলল যে, এ আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, "আল্লাহ্ কখনই মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোন পথ রাখবেন না" অথচ কাফেররা মুমিনদের উপর বিজয়ী হচ্ছে । তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আয়াতের প্রথমাংশের দিকে তাকাও । সেখানে বলা হয়েছে, 'কিয়ামতের দিন' । সুতরাং কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কখনই মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোন পথ রাখবেন না । [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩০৯; দ্বিয়া আল-মাকদেসী, আল-আহাদিসুল মুখতারাহ ২/৪০৬-৪০৭, হাদীস নং ৭৯৩] তবে ইমামগণ এ আয়াত থেকে দুনিয়াতে এ মাসআলা নিয়েছেন যে, কোন কাফের কোন মুমিনের ওয়ারিশ হয় না । [আত-তা'লিকুল মুমাজ্জাদ আলা মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ] ।

(৩) কাফেরদের ধোঁকার কারণে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদেরকে ধোঁকায় ফেলা যুক্তিযুক্ত ও যথার্থ । এতে আল্লাহ্র জন্য খারাপ গুণ বিবেচিত হবে না । কারণ, এটি তাদের কর্মের বিপরীতে আল্লাহর কর্ম । অনুরূপ আলোচনা সূরা আল-বাকারার ৯ ও ১৫ নং আয়াতের

النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়, শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে⁽¹⁾।

مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾

১৪৩. দোটানায় দোদুল্যমান, না এদের দিকে, না ওদের দিকে⁽²⁾! আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন আপনি তার জন্য কখনো কোন পথ পাবেন না।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾

১৪৪. হে মুমিনগণ! মুমিনগণ ছাড়া কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি নিজেদের উপর

ব্যাখ্যাতেও বর্ণিত হয়েছে। তবে তাদেরকে কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ধোঁকায় ফেলবেন, তার বর্ণনায় সুদ্দী ও হাসান বসরী বলেন, কিয়ামতের দিন তাদেরকে কিছু নূর বা আলো দেয়া হবে, ফলে তারা মুমিনদের সাথে চলতে থাকবে। যেমনিভাবে তারা দুনিয়াতে মুমিনদের সাথে ছিল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সে নূর বা আলো ছিনিয়ে নিবেন। ফলে তাদের আলো নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। তখন তারা অন্ধকারে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। আর ঠিক তখনি তাদের ও মুমিনদের মধ্যে প্রাচীর পড়ে যাবে। পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] মূলত: এটি সূরা আল-হাদীদের ১৩ নং আয়াতের তাফসীরও বটে।

(১) আয়াতে মুনাফিকদের তিনটি খারাপ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। এক. তারা তাদের সালাতে অলসতা করে। দুই. তারা সালাতে প্রদর্শনেচ্ছাসহকারে দাঁড়ায়। তিন. তারা খুব কমই আল্লাহ্র যিকর করে। পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও তাদের এ বদ স্বভাবসমূহের কথা উল্লেখিত হয়েছে। যেমন, সূরা আত-তাওবাহ: ৫৪; সূরা আল-মা'উন: ৪-৬। তাছাড়া হাদীসেও মুনাফিকের এ সমস্ত চরিত্রের কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ঐটি হচ্ছে মুনাফিকের সালাত। সে সূর্যের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর যখন সূর্য শয়তানের দু' শিংয়ের মাঝখানে পৌঁছে (অর্থাৎ ডুবার কাছাকাছি পৌঁছে) তখন সে উঠে চারবার ঠোকর লাগায়। যাতে আল্লাহ্র স্মরণ খুব কমই করে থাকে।' [মুসলিম: ৬২২]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুনাফিকের উদাহরণ হচ্ছে, ঐ ছাগীর ন্যায়, যে দুই পাঠা ছাগলের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। (প্রবৃত্তির তাড়নায়) কখনও এটার কাছে যায়, কখনও অপরটির কাছে যায়। [মুসলিম: ২৭৮৪] মুনাফিক নিজেকে মুশরিকও বলতে চায় না। আবার ঈমানদারও হতে চায় না। [তাবারী]

আল্লাহ্‌র প্রকাশ্য অভিযোগ কায়েম করতে চাও⁽¹⁾?

إِنَّ الْمُنٰفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

১৪৫. মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে⁽²⁾ এবং তাদের জন্য আপনি কখনো কোন সহায় পাবেন না ।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللّٰهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾

১৪৬. কিন্তু যারা তাওবাহ্ করে, নিজেদেরকে সংশোধন করে⁽³⁾, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তাদের দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে⁽⁴⁾,

---

(১) এ আয়াতের তাফসীরে পূর্ববর্তী ১৩৯ নং আয়াতের তাফসীর ও সূরা আলে ইমরানের ২৮ নং আয়াতের তাফসীর দেখা যেতে পারে ।

(২) এ আয়াতে মুনাফিকদের স্থান নির্দেশ করে বলা হয়েছে যে, তারা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে । অন্য স্থানে ফির'আউন ও তার অনুসারীদের জন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে । "আগুন, তাদেরকে তাতে উপস্থিত করা হয় সকাল ও সন্ধ্যায় এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে, 'ফির'আউন গোষ্ঠীকে নিক্ষেপ কর কঠোর শাস্তিতে" [সূরা গাফির: ৪৬] আবার অন্যত্র বনী ইসরাইলের মধ্যে যাদেরকে আকাশ থেকে দস্তরখানসহ খাবার দেয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে যারা কুফরী করবে তাদের জন্য এমন শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে শাস্তি আল্লাহ্ আর কাউকে দিবেন না । "আল্লাহ্ বললেন, 'আমিই তোমাদের কাছে ওটা পাঠাব; কিন্তু এর পর তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরী করলে তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের আর কাউকেও দেব না" [সূরা আল-মায়িদাহ: ১১৫] সুতরাং এটাই বলা চলে যে, সবচেয়ে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে এ তিন শ্রেণীর লোক । [আদওয়াউল বায়ান] এ আয়াতে বর্ণিত 'দারকুল আসফাল' বা নিম্নতম স্তর কি এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সেটা হবে বদ্ধ সিন্ধুক । [মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবাহ: ১৩/১৫৪, নং ১৫৯৭২] আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দারকুল আসফাল হচ্ছে, এমন কিছু ঘর যেগুলোর দরজা বন্ধ করা আছে । আর সেগুলোকে উপর ও নিচ থেকে প্রজ্জলিত করা হবে । [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবন আব্বাস বলেন, এর অর্থ, জাহান্নামের নীচে থাকবে । [তাবারী]

(৩) কাতাদাহ বলেন, এখানে সংশোধন করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে নেয়া । [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৪) এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে একমাত্র ঐসব আমলই গৃহীত ও কবুল হয় যা শুধু তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং কোনরূপ রিয়া তথা লোক দেখানো ও শোনানোর লেশমাত্র উদ্দেশ্য যার মধ্যে নেই ।

তারা মুমিনদের সঙ্গে থাকবে এবং মুমিনদেরকে আল্লাহ্ অবশ্যই মহাপুরস্কার দেবেন।

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿١٤٧﴾

১৪৭. তোমরা যদি শোকর-গুজার হও(১) এবং ঈমান আন, তবে তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহ্ কি করবেন? আর আল্লাহ্ (শোকরের) পুরস্কার দাতা, সর্বজ্ঞ।

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿١٤٨﴾

১৪৮. মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না; তবে যার উপর যুলুম করা হয়েছে(২)। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা,

---

(১) আয়াতে শোকর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর আসল অর্থ হচ্ছে নেয়ামতের স্বীকৃতি দেয়া ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা এবং অনুগৃহীত হওয়া। এ ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃতজ্ঞ না হও এবং তাঁর সাথে নিমকহারামী না কর; বরং যথার্থই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ও শোকর আদায়কারী হও তাহলে আল্লাহ্ অনর্থক তোমাদের শাস্তি দেবেন না। মোটকথা: আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার এবং শোকরগুজারকে শাস্তি দিবেন না। [তাবারী] কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, অনুগ্রহকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক পদ্ধতি কি? বস্তুত: হৃদয়ের সমগ্র অনুভূতি দিয়ে তার অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেয়া, মুখে এ অনুভূতির স্বীকারোক্তি করা এবং কার্যকলাপের মাধ্যমে অনুগৃহীত হওয়ার প্রমাণ পেশ করাই হচ্ছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক উপায়। এ তিনটি কাজের সমবেত রূপই হচ্ছে শোকর। এ শোকরের দাবী হচ্ছে প্রথমতঃ অনুগ্রহকে অনুগ্রহকারীর অবদান বলে স্বীকার করা। অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে অনুগ্রহকারীর সাথে আর কাউকে অংশীদার না করা। দ্বিতীয়তঃ অনুগ্রহকারীর প্রতি ভালবাসা, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের অনুভূতি নিজের হৃদয়ে ভরপুর থাকা এবং অনুগ্রহকারীর বিরোধীদের প্রতি এ প্রসঙ্গে বিন্দুমাত্র ভালবাসা, আন্তরিকতা, আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক না থাকা। তৃতীয়তঃ অনুগ্রহকারীর আনুগত্য করা, তার হুকুম মেনে চলা, তার নেয়ামগুলোকে তার মর্জির বাইরে ব্যবহার না করা।

(২) এ আয়াতে দুনিয়া হতে জোর-যুলুমের অবসান ঘটানোর এক অপূর্ব বিধান পেশ করা হয়েছে। যার মধ্যে একদিকে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও অপরাধ দমনের জন্য মযলুমকে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে তাকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আধিকার দিয়েছে। অন্যদিকে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আবার যুলুম ও বাড়াবাড়ি করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, “যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে তোমাদের উপর যে পরিমাণ যুলুম করা

সর্বজ্ঞ।

১৪৯. তোমরা সৎকাজ প্রকাশ্যে করলে বা গোপনে করলে কিংবা দোষ ক্ষমা করলে তবে আল্লাহ্ও দোষ মোচনকারী, ক্ষমতাবান⁽¹⁾।

إِنۡ تُبۡدُوۡا خَيۡرًا اَوۡ تُخۡفُوۡهُ اَوۡ تَعۡفُوۡا عَنۡ سُوۡٓءٍ فَاِنَّ
اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيۡرًا ﴿١٤٩﴾

হয়েছে, তোমরা ঠিক ততটুকুই প্রতিশোধ নিতে পার।" [সূরা আন-নাহল: ১২৬] সাথে সাথে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা ও অধিকার থাকা সত্ত্বেও যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং ক্ষমা করে দাও, তবে নিঃসন্দেহে তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম। মোটকথাঃ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, মযলুম ব্যক্তি যদি অত্যাচারীর অন্যায়-অত্যাচারের কাহিনী লোকদের কাছে প্রকাশ করে বা আদালতে অভিযোগ করে, তবে তা হারাম গীবতের আওতায় পড়বে না। কারণ যালিম নিজেই মযলুমকে অভিযোগ উত্থাপন করতে সুযোগ করে দিয়েছে, বরং বাধ্য করেছে।

(১) আল্লাহ্ তা'আলা একদিকে মযলুমকে তার প্রতি যুলুমের সমতুল্য প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন। অপরদিকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার পরিবর্তে উন্নত চরিত্রের শিক্ষা ও ক্ষমার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য আখেরাতের উত্তম প্রতিদানের আশ্বাস শুনিয়ে ক্ষমা ও ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছেন। এ আয়াতে মুখ্য উদ্দেশ্য কারো অন্যায়কে ক্ষমা করার আদর্শ শিক্ষা দেয়া। প্রকাশ্যে বা গোপনে নেক কাজ করার উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ক্ষমা করাও একটি বিশিষ্ট সৎকার্য। যে ব্যক্তি অন্যের অপরাধ মার্জনা করবে, সে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও করুণার যোগ্য হবে। আয়াতের শেষে আল্লাহ্র দু'টি গুণবাচক নাম উল্লেখ করে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান, যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিতে পারেন এবং যখন ইচ্ছা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন। তথাপি তিনি অতি ক্ষমাশীল। আর মানুষের শক্তি ও ক্ষমতা যখন সামান্য ও সীমাবদ্ধ, তাই ক্ষমা বা মার্জনার পথ অবলম্বন করা তার জন্য অধিক বাঞ্ছনীয়।

এ হচ্ছে অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধ ও সামাজিক সংস্কার সাধনের ইসলামী মূলনীতি এবং অভিভাবকসুলভ সিদ্ধান্ত। একদিকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার প্রদান করে ইনসাফ ও ন্যায়নীতিকে সমুন্নত রাখা হয়েছে, অপরদিকে উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে ক্ষমা বা মার্জনা করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ "তোমার ও অন্য যে ব্যক্তির মধ্যে দুশমনী ছিল, এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি আন্তরিক বন্ধু হয়ে যাবে।" [সূরা ফুস্সিলাতঃ ৩৪] আইন-আদালত বা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মাধ্যমে যদিও অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধ করা যায়, কিন্তু এর দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া অব্যাহত থাকে। যার ফলে পারস্পরিক বিবাদের সূত্রপাত হওয়ার

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ
أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ
بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَيُرِيدُونَ أَنْ
يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ۝١٥٠

১৫০. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে (ঈমানের ব্যাপারে) তারতম্য করতে চায় এবং বলে, ‘আমরা কতক-এর উপর ঈমান আনি এবং কতকের সাথে কুফরী করি’(১)। আর তারা মাঝামাঝি একটা পথ অবলম্বন করতে চায়,

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
عَذَابًا مُهِينًا ۝١٥١

১৫১. তারাই প্রকৃত কাফির। আর আমরা প্রস্তুত রেখেছি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি(২)।

আশংকা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু কুরআনুল কারীম যে অপূর্ব নৈতিকতার আদর্শ শিক্ষা দিয়েছে, তার ফলে দীর্ঘকালের শত্রুতাও গভীর বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘সাদকাহ দ্বারা সম্পদ কমে না এবং কোন বান্দার মধ্যে ক্ষমা প্রবণতার গুণের কারণে আল্লাহ্ তা‘আলা কেবল তার মর্যাদাই বৃদ্ধি করেন। আর যে কেউ আল্লাহ্র জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ্ তাকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেন।’ [মুসলিম: ২৫৮৮]

(১) কাতাদা বলেন, এরা হচ্ছে, আল্লাহ্র দুশমন ইয়াহূদ ও নাসারা সম্প্রদায়। কারণ, তাদের মধ্যে ইয়াহূদীরা তাওরাত ও মূসার উপর ঈমান আনে কিন্তু ইঞ্জীল ও ঈসার উপর ঈমান আনে না। আর নাসারারা ইঞ্জীল ও ঈসার উপর ঈমান আনে কিন্তু কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ঈমান আনে না। এভাবে এ দু’টি সম্প্রদায় ইয়াহূদী ও নাসারা হয়েছে। অথচ এ দু’টি মতই বিদ‘আত বা নব উদ্ভাবিত। যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয়। এভাবে তারা সমস্ত নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহ্ প্রদত্ত দ্বীন ইসলামকে পরিত্যাগ করেছে। [তাবারী]

(২) পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত স্পষ্ট ঘোষণা ঐসব বিভ্রান্ত লোকদের হীনমন্যতা ও গোঁজামিলকেও ফাঁস করে দিয়েছে, যারা অন্যান্য ধর্মানুসারীদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজেদের দ্বীন ও দ্বীনী বিশ্বাসকে বিজাতির পদমূলে উৎসর্গ করতে ব্যগ্র। যারা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ফয়সালাকে উপেক্ষা করে অন্যান্য ধর্মানুসারীদেরকেও মুক্তি লাভ করবে বলে বুঝাতে চায়। অথচ তারা অধিকাংশ রাসূলকে অথবা অন্তত কোন কোন নবীকে অমান্য করে। যার ফলে তাদের কাফের ও জাহান্নামী হওয়ার কথা অত্র আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে।

অমুসলিমদের প্রতি ইনসাফ, ন্যায়নীতি, সমবেদনা, সহানুভূতি, উদারতা ও ইহ্সান বা হিতকামনার দিক দিয়ে ইসলাম নজীরবিহীন। ইসলাম একদিকে মুসলিমদের

প্রতি সদ্ব্যবহার ও পরমসহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে যেমন উদার ও অবারিত দ্বার, অপরদিকে স্বীয় সীমারেখা সংরক্ষণের ব্যাপারে অতি সতর্ক, সজাগ ও কঠোর। ইসলাম অমুসলিমদের প্রতি উদারতার সাথে সাথে কুফরী ও কু-প্রথার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলিম ও অমুসলিমরা দু'টি পৃথক জাতি এবং মুসলিমদের জাতীয় প্রতীক ও স্বাতন্ত্র্য সযত্নে সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। শুধু 'ইবাদাতের ক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলে চলবে না, বরং সামাজিকতার ক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে। এ কথা কুরআন ও হাদীসে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনুল কারীম ও ইসলামের অভিমত যদি এই হতো যে, যে কোন ধর্মমতের সাহায্যে মুক্তি লাভ করা সম্ভব, তাহলে ইসলাম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের জিহাদ পরিচালনা করা এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত ও কুরআন নাযিল করারও কোন প্রয়োজন থাকতো না।

পবিত্র কুরআনের এক জায়গায় বলা হয়েছে, "নিশ্চয় যারা সত্যিকারভাবে ঈমান এনেছে (মুসলিম হয়েছে) এবং যারা ইয়াহূদী হয়েছে এবং নাসারা (খৃষ্টান) ও সাবেয়ীনদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি ও কেয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছে আর সৎকাজ করেছে, তাদের পালনকর্তার সমীপে তাদের জন্য পূর্ণ প্রতিদান সংরক্ষিত রয়েছে। তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না"। [সূরা আল-বাকারাহ: ৬২] এ আয়াত থেকেও ভুল বোঝার কোন অবকাশ নেই। কেননা, কুরআনের পরিভাষায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান শুধু তখনই গ্রহণযোগ্য ও ধর্তব্য হয় যখন তার সাথে নবী-রাসূল, ফিরিশ্তা ও আসমানী কিতাবের প্রতিও ঈমান আনা হয়। তাই তাদের প্রত্যেককে সাধারণ মুসলিমদের মত পুরোপুরি ঈমান আনতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমানের পাশাপাশি নবী-রাসূলগণের প্রতিও ঈমান আনা অপরিহার্য। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে (চিনে রাখুন যে) তারা আল্লাহ্ ও রাসূলের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট। অতএব, আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের মোকাবেলায় যথেষ্ট এবং তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন"। [সূরা আল-বাকারাহ্ঃ ১৩৭] সূরা আন- নিসার আলোচ্য আয়াতে আরো স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত কোন একজন নবীকেও যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে সে প্রকাশ্য কাফের, তার জন্য জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব অবধারিত। রাসূলের প্রতি ঈমান ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সত্যিকার ঈমান সাব্যস্ত হয় না। শেষ আয়াতে পুনরায় দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আখেরাতের মুক্তি ও কামিয়াবী শুধু ঐসব লোকের জন্যই সংরক্ষিত যারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমানের সাথে সাথে তাঁর নবী ও রাসূলগণের প্রতি যথার্থ ঈমান রাখে। বস্তুত: কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা ও তাফসীর করে। কুরআনী তাফসীরের পরিপন্থী কোন তাফসীর বর্ণনা কারো জন্য জায়েয নয়।

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمْ يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ أَحَدٍ
مِّنْهُمْ أُو۟لَٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ
غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٥٢﴾

১৫২. আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাদের একের সাথে অপরের পার্থক্য করেনি, অচিরেই তাদেরকে তিনি তাদের প্রতিদান দেবেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

বাইশতম রুকূ’

يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَٰبًا مِّنَ
ٱلسَّمَآءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُوا۟ مُوسَىٰٓ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوٓا۟
أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ
ثُمَّ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ
ٱلْبَيِّنَٰتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ
سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ﴿١٥٣﴾

১৫৩. কিতাবীগণ আপনার কাছে তাদের জন্য আসমান হতে একটি কিতাব নাযিল করতে বলে; তারা মূসার কাছে এর চেয়েও বড় দাবী করেছিল। তারা বলেছিল, ‘আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌কে দেখাও।’ ফলে তাদের সীমালংঘনের কারণে তাদেরকে বজ্র পাকড়াও করেছিল; তারপর স্পষ্ট প্রমাণ তাদের কাছে আসার পরও তারা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল; অতঃপর আমরা তা ক্ষমা করেছিলাম এবং আমরা মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করেছিলাম।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَٰقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ
ٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا۟ فِى
ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿١٥٤﴾

১৫৪. আর তাদের অঙ্গীকার গ্রহণের জন্য ‘তূর’ পর্বতকে আমরা তাদের উপর উত্তোলন করেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, ‘নত শিরে দরজা দিয়ে প্রবেশ কর(১)।’ আর আমরা তাদেরকে আরও বলেছিলাম, ‘শনিবারে সীমালংঘন

---

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাঈলকে বলা হয়েছিল যে, তোমরা (প্রস্তাবিত শহরে) সিজদারত অবস্থায় প্রবেশ কর এবং বল, (হে আল্লাহ্ !) আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তারা তা পরিবর্তন (সিজদারত অবস্থায় প্রবেশ না করে) নিতম্বের উপর ভর করে এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন এর পরিবর্তে যবের দানা চাই বলতে বলতে প্রবেশ করল। [বুখারীঃ ৩৪০৩]

করো না'; এবং আমরা তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম ।

১৫৫. অতঃপর (তারা অভিসম্পাত পেয়েছিল⁽¹⁾) তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য, আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করার জন্য, নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য এবং 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত' তাদের এ উক্তির জন্য । বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ্ তার উপর মোহর মেরে দিয়েছেন । সুতরাং কেবল অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান আনবে ।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ
بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ
اِلَّا قَلِيْلًا ۪﴿١٥٥﴾

১৫৬. আর তাদের কুফরীর জন্য এবং মার্‌ইয়ামের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদের জন্য⁽²⁾ ।

وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ۙ﴿١٥٦﴾

---

(১) বলা হয়েছে, 'আর তাদের অঙ্গিকার ভঙ্গের কারণে এবং---' কিন্তু এর কারণে কি হয়েছে সেটা বলা হয় নি । বরং উত্তরটি উহ্য রাখা হয়েছে । সূরা আল-মায়িদাহ এর ১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর তাদের অঙ্গিকার ভঙ্গের জন্য আমরা তাদেরকে লা'নত করেছিলাম' । সুতরাং এখানেও একই অর্থ গ্রহণ করা যায় । যাজ্জাজ বলেন, আয়াতের উত্তর হচ্ছে, তাদের অঙ্গিকার ভঙ্গের কারণে তাদের উপর আমরা অনেক হালাল বস্তু হারাম করেছি । কারণ, ১৬০ নং আয়াতে তা-ই বর্ণিত হয়েছে । কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এ আয়াতের শেষে বর্ণিত, 'বরং আল্লাহ্ তাদের উপর মোহর করেছেন' এ কথাটিই উপরোক্ত কথার উত্তর । আবার কারও কারও মতে, আয়াতের শেষে বর্ণিত, 'কেবল অল্প সংখ্যকই ঈমান আনবে' এটাই হচ্ছে পূর্ববর্তী কথার উত্তর । [ফাতহুল কাদীর]

(২) মারইয়ামের উপর চাপানো তাদের গুরুতর অপবাদ কি ছিল তা এখানে বর্ণনা করা হয় নি । অন্যত্র এসেছে যে, তারা মারইয়ামকে ব্যভিচারের অপবাদ দিতে ত্রুটি করে নি । আল্লাহ্ বলেন, "তারপর সে সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হল; তারা বলল, 'হে মার্‌ইয়াম! তুমি তো এক অদ্ভুত জিনিস নিয়ে এসেছ" । [সূরা মারইয়াম:২৭] এখানে অঘটন বলতে তারা ব্যভিচারের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছিল । কারণ পরবর্তী আয়াতে মারইয়ামের বাবা খারাপ লোক না হওয়া এবং মা-ও বেশ্যা না হওয়া বলার মাধ্যমে সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে । [আদওয়াউল বায়ান]

১৫৭. আর 'আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল মার্‌ইয়াম তনয় 'ঈসা মসীহ্‌কে হত্যা করেছি' তাদের এ উক্তির জন্য। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং ক্রুশবিদ্ধও করেনি; বরং তাদের জন্য (এক লোককে) তার সদৃশ করা হয়েছিল(১)।

وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ
اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۗ وَاِنَّ
الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ۗ مَا لَهُمْ بِهٖ
مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ﴿١٥٧﴾

---

(১) এখানে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে, ওরা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে হত্যাও করতে পারেনি, শুলেও চড়াতে পারেনি, বরং আসলে ওরা সন্দেহে পতিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের সন্দেহ কি ছিল এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে, সব বর্ণনার সার কথা হচ্ছে, ইয়াহূদীরা যখন ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর হলো, তখন তার ভক্ত-সহচরবৃন্দ এক স্থানে সমবেত হলেন। ঈসা 'আলাইহিস্ সালামও সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন চার হাজার ইয়াহূদী দূরাচার একযোগে গৃহ অবরোধ করলো। তখন ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম স্বীয় ভক্ত অনুচরগণকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ এই ঘর থেকে বের হতে ও নিহত হতে এবং আখেরাতে জান্নাতে আমার সাথী হতে প্রস্তুত আছো কি? জনৈক ভক্ত আত্মোৎসর্গের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম নিজের জামা ও পাগড়ী তাঁকে পরিধান করালেন। অতঃপর তাঁকে ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর সাদৃশ করে দেয়া হলো। যখন তিনি ঘর থেকে বের হলেন, তখন ইয়াহূদীরা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম মনে করে তাঁকে বন্দী করে নিয়ে গেল এবং শুলে চড়িয়ে হত্যা করলো। অপরদিকে ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে আল্লাহ্ তা'আলা আসমানে তুলে নিলেন।

এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইয়াহূদীরা এক লোককে ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে হত্যা করার জন্য পাঠিয়েছিল। কিন্তু ইতোপূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আকাশে তুলে নেয়ায় সে তাঁর নাগাল পেল না। বরং ইতিমধ্যে তার নিজের চেহারা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর মত হয়ে গেল। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখন অন্যান্য ইয়াহূদীরা তাকেই ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম মনে করে পাকড়াও করলো, এবং শুলে বিদ্ধ করে হত্যা করলো। উক্ত বর্ণনা দু'টির মধ্যে যে কোনটিই সত্য হতে পারে। কুরআনুল কারীম এ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু ব্যক্ত করেনি। অতএব, প্রকৃত ঘটনার সঠিক খবর একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। অবশ্য কুরআনুল কারীমের আয়াত ও তাফসীর সংক্রান্ত বর্ণনার সমন্বয়ে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, প্রকৃত ঘটনা ইয়াহূদী-খৃষ্টানদেরও অজ্ঞাত ছিল। তারা চরম বিভ্রান্তির আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে শুধু অনুমান করে বিভিন্ন উক্তি ও দাবী করছিল। ফলে উপস্থিত লোকদের মধ্যেই চরম মতভেদ ও বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে যে, যারা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে নানা মত পোষন করে নিশ্চয় এ ব্যাপারে তারা সন্দেহে পতিত হয়েছে। তাদের কাছে এ

আর নিশ্চয় যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, তারা অবশ্যই এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। আর এটা নিশ্চিত যে, তারা তাঁকে হত্যা করেনি,

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۱۵۸﴾

১৫৮. বরং আল্লাহ্ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়(১)।

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ

১৫৯. কিতাবীদের মধ্য থেকে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে(২) তার উপর ঈমান

সম্পর্কে কোন সত্যনির্ভর জ্ঞান নেই। তারা শুধু অনুমান করে কথা বলে। আর তারা যে ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে হত্যা করেনি, এ কথা সুনিশ্চিত। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিরাপদে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, সম্বিত ফিরে পাওয়ার পর কিছু লোক বললো, আমরা তো নিজেদের লোককেই হত্যা করে ফেলেছি। কেননা, নিহত ব্যক্তির মুখমণ্ডল ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর মত হলেও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য রকম। তদুপরি এ ব্যক্তি যদি ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম হয়, তবে আমাদের প্রেরিত লোকটি গেল কোথায়? আর এ ব্যক্তি আমাদের হলে ঈসা 'আলাইহিস্ সালামই বা কোথায় গেলেন? মোটকথা: ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ইয়াহূদী ও নাসারা যারাই কথা বলে তারাই বিভ্রান্তিতে লিপ্ত। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই।

(১) "আল্লাহ্ অতি পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা (প্রজ্ঞাময়)।" ইয়াহূদীরা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে হত্যা করার যত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তই করুক না কেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর হেফাযতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন তখন তাঁর অসীম কুদরত ও অপার হেকমতের সামনে ওদের অপচেষ্টার কি মূল্য আছে? আল্লাহ্ তা'আলা প্রজ্ঞাময়, তাঁর প্রতিটি কাজে নিগূঢ় রহস্য বিদ্যমান রয়েছে। জড়পূজারী বস্তুবাদীরা যদি ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে সশরীরে আকাশে উত্তোলনের সত্যটি উপলব্ধি করতে না পারে, তবে তা তাদেরই দুর্বলতার প্রমাণ।

(২) অর্থাৎ ইয়াহূদীরা ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে যদিও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করে না এবং ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, এমনকি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তকেও অস্বীকার করে,

---

কিন্তু তাদের মৃত্যুর পূর্বে এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের দৃষ্টির সম্মুখে সত্য উন্মোচিত হবে, তখন তারা যথার্থই বুঝতে পারবে যে, ঈসা ‘আলাইহিস্ সালাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তাদের ধারণা একান্তই ভ্রান্তিপূর্ণ ছিল। এ আয়াতের موته অর্থাৎ ‘মৃত্যুর পূর্বে’ শব্দে ইয়াহূদীদের মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের তাফসীর এই যে, প্রত্যেক ইয়াহূদীই তার অন্তিম মুহূর্তে যখন আখেরাতের দৃশ্যাবলী অবলোকন করবে, তখন ঈসা ‘আলাইহিস্ সালাম-এর নবুওয়তের সত্যতা ও নিজেদের বাতুলতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তার প্রতি ঈমান আনয়ন করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তখনকার ঈমান তাদের আদৌ কোন উপকারে আসবে না; যেমন লোহিত সাগরে ডুবে মরার সময় ফির‘আওনের ঈমান ফলপ্রসূ হয়নি। এ আয়াতের দ্বিতীয় তাফসীর যা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের বিপুল জামা‘আত কর্তৃক গৃহীত ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, তা হলো موته ‘তার মৃত্যু’ শব্দের সর্বনামে ঈসা ‘আলাইহিস্ সালাম-এর মৃত্যু বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের তাফসীর হলো, কিতাবীরা এখন যদিও ঈসা ‘আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি সত্যিকার ঈমান আনে না, ইয়াহূদীরা তো তাকে নবী বলে স্বীকারই করে না, বরং ভণ্ড, মিথ্যাবাদী ইত্যকার আপত্তিকর বিশেষণে ভূষিত করে। অপরদিকে নাসারারা যদিও ঈসা মসীহ্ ‘আলাইহিস্ সালাম-কে ভক্তি ও মান্য করার দাবীদার; কিন্তু তাদের মধ্যে একদল ইয়াহূদীদের মতই ঈসা ‘আলাইহিস্ সালাম-এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার এবং মৃত্যুবরণ করার কথায় স্বীকৃতি প্রদান করে চরম মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছে। তাদের আরেক দল অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে ঈসা ‘আলাইহিস্ সালাম-কে স্বয়ং আল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র পুত্র বলে ধারণা করে বসেছে। কুরআনুল কারীমের এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে যে, ইয়াহূদী ও নাসারারা বর্তমানে যদিও ঈসা ‘আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি যথাযথ ঈমান রাখে না, বরং শৈথিল্য বা বাড়াবাড়ি করে, কিন্তু কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে তিনি যখন পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তখন এরাও তাঁর প্রতি পুরোপুরি ঈমান আনয়ন করবে। নাসারারা তখন মুসলিমদের মত সহীহ আকীদা ও বিশ্বাসের সাথে ঈমানদার হবে। ইয়াহূদীদের মধ্যে যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদেরকে নিধন ও নিশ্চিহ্ন করা হবে, অবশিষ্টরা ইসলাম গ্রহণ করবে। তখন সমগ্র দুনিয়া থেকে সর্বপ্রকার কুফরী ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাবে; সর্বত্র ইসলামের একচ্ছত্র প্রাধান্য কায়েম হবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঈসা ইবন মারইয়াম ‘আলাইহিস্ সালাম একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে অবশ্যই অবতরণ করবেন। তিনি দাজ্জালকে কতল করবেন, শুকর নিধন করবেন এবং ক্রুশকে চুরমার করবেন। তখন একমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলার ‘ইবাদাত করা হবে।’ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আরো বলেন - ‘তোমরা ইচ্ছা করলে এখানে কুরআনুল কারীমের এ আয়াত পাঠ করতে পার যাতে বলা হয়েছেঃ “আহলে-কিতাবদের মধ্যে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না, বরং ওরা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তাঁর

আনবেই। আর কেয়ামতের দিন তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবেন⁽¹⁾।

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ﴿١٥٩﴾

১৬০. সুতরাং ভাল ভাল যা ইয়াহূদীদের জন্য হালাল ছিল আমরা তা তাদের জন্য হারাম করেছিলাম তাদের যুলুমের জন্য(২) এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে অনেককে বাধা দেয়ার জন্য।

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿١٦٠﴾

১৬১. আর তাদের সূদ গ্রহণের কারণে, অথচ তা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল; এবং অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ গ্রাস করার কারণে। আর

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾

প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।" [বুখারীঃ ৩৪৪৮] আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ এর অর্থ ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর মৃত্যুর পূর্বে'। এ বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন। অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তখন তোমাদের কেমন লাগবে? যখন ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম তোমাদের মাঝে আগমন করবেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে ঈমাম হবেন'। [বুখারীঃ ৩৪৪৯] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! অবশ্যই ইবন মারইয়াম 'ফাজ্জ আর রাওহা' থেকে হজ্জ বা উমরা অথবা উভয়টির জন্যই ইহরাম বাঁধবেন।' [মুসলিম: ১২৫২] অন্য হাদীসে এসেছে, 'ইবন মারইয়াম দাজ্জালকে 'বাবে লুদ' এ হত্যা করবে'। [তিরমিযী: ২২৪৪] মোটকথা: কিয়ামতের পূর্বে ঈসা আলাইহিস সালামের আগমনের ব্যাপারটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যখন তিনি আসবেন তখন সমস্ত বিভ্রান্ত নাসারা ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হবে।

(১) কাতাদা বলেন, এর অর্থ তিনি সাক্ষ্য দিবেন যে, তিনি তাদের কাছে তার রবের রিসালত পৌঁছে দিয়েছেন এবং তিনি যে বান্দা এ কথার স্বীকৃতি প্রদান করবেন। [তাবারী]

(২) ইসলামী শরী'আতেও কোন কোন দ্রব্য পানাহার করা হারাম ঘোষিত হয়েছে। তবে তা শারিরিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষতিকর হওয়ার কারণে। পক্ষান্তরে ইয়াহূদীদের জন্য কোন দৈহিক বা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর হওয়ার কারণে পবিত্র দ্রব্য হারাম করা হয়নি, বরং তাদের অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ সেগুলো হারাম করা হয়েছিল। তাদের উপর কোন কোন জিনিস হারাম করা হয়েছিল তা সূরা আল-আন'আমের ১৪৬ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

আমরা তাদের মধ্য হতে কাফিরদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ
يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٦٢﴾

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে মজবুত তারা ও মুমিনগণ আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার আগে যা নাযিল করা হয়েছে তাতে ঈমান আনে। আর সালাত প্রতিষ্ঠাকারী, যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান আনয়নকারী, তাদেরকে অচিরেই আমরা মহা পুরস্কার দেব(১)।

তেইশতম রুকূ'

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ
مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ
وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى

১৬৩. নিশ্চয় আমরা আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম(২), যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছিলাম(৩)। আর ইবরাহীম,

---

(১) এ আয়াতে কতিপয় মহান ব্যক্তির জন্য যে বিপুল প্রতিদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে, তা তাঁদের ঈমান ও সৎকর্মের কারণে। তবে অবশ্যই ঈমানের সাথে মৃত্যুর সৌভাগ্য হতে হবে।

(২) নবীগণের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নির্দেশ ও বাণীকে ওহী বলা হয়। হারিস ইবন হিশাম রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার নিকট অহী কিভাবে আসে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'অহী কোন কোন সময় ঘন্টার আওয়াজের মত আমার নিকট আসে। আর ওটাই আমার পক্ষে সবচেয়ে কষ্টদায়ক অহী, এরপর ফেরেশ্তা আমার থেকে পৃথক হতো এমতাবস্থায় যে, তিনি যা বলেন তা শেষ হতেই তার কাছ থেকে আমি তা আয়ত্ব করে ফেলি। আবার কোন কোন সময় ফেরেশ্তা মানুষের আকারে এসে আমাকে যে অহী বলেন, আমি তা সাথে সাথে আয়ত্ব করে নেই। [বুখারীঃ ২]

(৩) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি যেমন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী নাযিল হয়েছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিও তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা ওহী নাযিল করেছেন। অতএব, পূর্ববর্তী নবীগণকে যারা মান্য করে, তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কেও মান্য করতে বাধ্য। আর যারা

وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيۡمَٰنَۚ وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورٗا ١٦٣

ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তার বংশধরগণ, ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন ও সুলাইমানের নিকটও ওহী প্রেরণ করেছিলাম এবং দাউদকে প্রদান করেছিলাম যাবূর।

وَرُسُلٗا قَدۡ قَصَصۡنَٰهُمۡ عَلَيۡكَ مِن قَبۡلُ وَرُسُلٗا لَّمۡ نَقۡصُصۡهُمۡ عَلَيۡكَۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا ١٦٤

১৬৪. আর অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা আমরা আপনাকে পূর্বে দিয়েছি এবং অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা আমরা আপনাকে দেইনি(১)। আর অবশ্যই আল্লাহ্ মূসার সাথে কথা বলেছেন।

رُّسُلٗا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ

১৬৫. সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি(২), যাতে রাসূলগণ

তাকে অস্বীকার করে তারা যেন অন্যসব নবীকে এবং তাদের প্রতি প্রেরিত ওহীকেও অস্বীকার করলো।

(১) এ আয়াতে নূহ 'আলাইহিস্ সালাম-এর পরে যেসব নবী-রাসূল আগমন করেছেন, তাদের সম্পর্কে প্রথমে সাধারণভাবে বলার পর তন্মধ্যে বিশিষ্ট ও মর্যাদাসম্পন্ন কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝানো হয়েছে যে, এরা সবাই আল্লাহ্র রাসূল এবং তাদের নিকটও বিভিন্ন পন্থায় ওহী প্রেরিত হয়েছে। কখনো ফিরিশ্তাদের মাধ্যমে ওহী পৌঁছেছে, কখনো লিপিবদ্ধ কিতাব আকারে এসেছে, আবার কখনো আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলের সাথে পর্দার আড়াল থেকে কথোপকথন করেছেন। যে কোন পন্থায়ই ওহী পৌঁছুক না কেন, তদানুযায়ী আমল করা মানুষের একান্ত কর্তব্য। অতএব, ইয়াহূদীদের এরূপ আবদার করা যে, তাওরাতের মত লিখিত কিতাব নাযিল হলে আমরা মান্য করবো, অন্যথায় নয় -সম্পূর্ণ আহম্মকী ও স্পষ্ট কুফরী। আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, যাদের মধ্যে স্বতন্ত্র শরী'আতের অধিকারী রাসূলের সংখ্যা ছিল তিনশ' তের জন'। [সহীহ্ ইবন হিব্বানঃ ৩৬১]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের ঈমান ও সৎকর্মশীলতার পুরস্কারস্বরূপ জান্নাতের সুসংবাদ দান করার জন্য এবং কাফের, বেঈমান ও দূরাচারদের কুফরী ও অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে, দেশে দেশে অব্যাহতভাবে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, যেন কিয়ামতের শেষ বিচারের দিনে অবাধ্য ব্যক্তিরা অজুহাত উত্থাপন করতে না পারে যে, হে আল্লাহ্! কোন কাজে আপনি সন্তুষ্ট আর কোন কাজে আপনি অসন্তুষ্ট হন, তা আমরা উপলব্ধি করতে

عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٦٥﴾

আসার পর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿١٦٦﴾

১৬৬. কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন আপনার প্রতি যা তিনি নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে। তিনি তা নাযিল করেছেন নিজ জ্ঞানে। আর ফেরেশতাগণও সাক্ষী দিচ্ছেন। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট(১)।

পারিনি। জানতে পারলে অবশ্যই আমরা আপনার সন্তুষ্টির পথ অবলম্বন করতাম। অতএব, আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনীয় এবং আমরা নিরপরাধ। পথভ্রষ্ট লোকেরা যাতে এহেন অজুহাত পেশ করতে বা বাহানার আশ্রয় নিতে না পারে, তজ্জন্য আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট নিদর্শনসহ নবীগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁরা সর্বস্ব উৎসর্গ করে সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন। অতএব, এখন আর সত্য দ্বীন ইসলাম গ্রহণ না করার ব্যাপারে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না, কোন বাহানারও অবকাশ নেই। আল্লাহ্‌র ওহী এমন এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ যার মোকাবেলায় অন্য কোন প্রমাণই কার্যকর হতে পারে না। কুরআনুল কারীম এমন এক অকাট্য দলীল যার সামনে কোন অযুক্তি টিকতে পারে না। এ আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য সূরা ত্বা-হা এর ১৩৪ এবং সূরা আল-কাসাস এর ৪৭ নং আয়াত দেখা যেতে পারে।

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে একদল ইয়াহূদী উপস্থিত হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা সন্দেহাতীতভাবে জান যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার সত্য রাসূল। তারা অস্বীকার করলো। তখনই উক্ত আয়াত নাযিল হলো- আল্লাহ্ তা'আলা ঐ কিতাবের (আল-কুরআনের) মাধ্যমে -যা তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞানের নিদর্শন- আপনার নবুওয়াতের সাক্ষী দিচ্ছেন। আর ফিরিশ্‌তাগণও এর সাক্ষী। অধিকন্তু সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষ্যদানের পর আর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন নেই। [তাবারী, আত-তাফসীরুস সহীহ] এ আয়াতে কুরআনের সত্যতার উপর সাক্ষ্যদানের পাশাপাশি কুরআন যার উপর নাযিল হয়েছে তার সত্যতার উপরও সাক্ষ্য প্রদান হয়ে গেছে। তাছাড়া অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা শুধু কুরআনের জন্যও এ সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন, "আর আমরা সত্য-সহই কুরআন নাযিল করেছি এবং তা সত্য-সহই নাযিল হয়েছে। আমি তো আপনাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি।" [সূরা আল-ইসরা: ১০৫]

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ
قَدْ ضَلُّوا ضَلٰلًا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾

১৬৭. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে বাধা দিয়েছে তারা অবশ্যই ভীষনভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ
لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾

১৬৮. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে ও যুলুম করেছে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোন পথও দেখাবেন না,

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ
عَلَى اللّٰهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾

১৬৯. জাহান্নামের পথ ছাড়া; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে এবং এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ।

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ
رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلّٰهِ
مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾

১৭০. হে লোকসকল! অবশ্যই রাসূল তোমাদের রবের কাছ থেকে সত্য নিয়ে এসেছেন; সুতরাং তোমরা ঈমান আন, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে⁽¹⁾ আর যদি তোমরা কুফরী কর তবে আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে সব আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا

১৭১. হে কিতাবীরা! স্বীয় দ্বীনের মধ্যে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না⁽²⁾ এবং

---

(১) অর্থাৎ একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের মধ্যেই হেদায়াত সীমাবদ্ধ; তাঁর অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ করা চরম গোমরাহী। অতএব, ইয়াহূদীদের ধ্যান-ধারণা, ধর্ম-কর্ম ভ্রান্ত ও বাতিল।

(২) غُلُوّ শব্দের অর্থ সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। অর্থাৎ দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার অর্থ তার ন্যায়সঙ্গত সীমারেখা অতিক্রম করা। আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহূদী-নাসারা উভয় জাতিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, দ্বীনের ব্যাপারে কোনরূপ বাড়াবাড়ি করো না। কারণ এ বাড়াবাড়ি রোগে উভয় জাতিই আক্রান্ত হয়েছে। নাসারারা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। তাকে স্বয়ং আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র পুত্র অথবা তিনের এক আল্লাহ্ বানিয়ে দিয়েছে। অপরদিকে ইয়াহূদীরা তাঁকে অমান্য ও প্রত্যাখ্যান করার দিক দিয়ে বাড়াবাড়ি পথ অবলম্বন করেছে। তারা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে আল্লাহ্‌র নবী হিসেবে স্বীকার করেনি।

عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ
مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰهَاۤ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ
مِّنْهُ ۫ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَلَا تَقُوْلُوْا

আল্লাহ্‌র উপর সত্য ব্যতীত কিছু বলো না। মার্‌ইয়াম-তনয় 'ঈসা মসীহ কেবল আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর বাণী(১), যা তিনি মার্‌ইয়ামের

বরং তাঁর মাতা মারইয়াম 'আলাইহাস্ সালাম-এর উপর মারাত্মক অপবাদ আরোপ করেছে এবং তার নিন্দাবাদ করেছে। দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবড়ি ও সীমালংঘনের কারণে ইয়াহূদী ও নাসারাদের গোমরাহী ও ধ্বংস হওয়ার শোচনীয় পরিণতি বার বার প্রত্যক্ষ হয়েছে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় উম্মতকে এ ব্যাপারে সংযত থাকার জন্য সতর্ক করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 'তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে এমন অতিরঞ্জিত করো না, যেমন নাসারারা ঈসা ইবন মারইয়াম 'আলাইহিমুস্ সালাম-এর ব্যাপারে করেছে। স্মরণ রাখবে যে, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা। অতএব, আমাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল বলবে।' [বুখারীঃ ৩৪৪৫] অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বান্দা ও মানুষ হিসেবে আমিও অন্য লোকদের সমপর্যায়ের। তবে আমার সবচেয়ে বড় মর্যাদা এই যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। এর চেয়ে অগ্রসর করে আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার কোন বিশেষণে বিশেষিত করা বাড়াবাড়ি বৈ নয়। তোমরা ইয়াহূদী-নাসারাদের মতো বাড়াবাড়ি করো না। হাদীসে এসেছে যে, হজের সময় 'রমীয়ে জামারাহ্' অর্থাৎ কংকর নিক্ষেপের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা-কে কংকর আনতে আদেশ করলেন। তিনি মাঝারি আকারের পাথরকুচি নিয়ে এলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং বললেন, 'এ ধরণের মাঝারী আকারের কংকর নিক্ষেপ করাই পছন্দনীয়।' বাক্যটি তিনি দু'বার বললেন। তারপর বললেন, 'তোমরা দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি থেকে দূরে থেকো। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ তাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। [ইবন মাজাহঃ ৩০২৯] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি কাজ করলেন যাতে রুখসত বা ছাড় ছিল। কিন্তু কিছু লোক সেটা করতে অপছন্দ করল। সেটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি আল্লাহ্‌র হামদ ও প্রশংসার পর বললেন, কিছু লোকের এ কি অবস্থা হয়েছে যে, তারা আমি যা করছি তা করা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়? আল্লাহ্‌র শপথ, আল্লাহ্‌র ব্যাপারে আমি তাদের থেকে সবচেয়ে বেশী জানি এবং তাদের থেকেও বেশী আল্লাহ্‌র ভয় করি।' [বুখারীঃ ৭৩০১]

(১) এখানে 'কালেমাতুহূ' শব্দে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র কালেমা। মুফাস্‌সিরগণ এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন-

(এক) 'কালেমাতুল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র সুসংবাদ। এর দ্বারা ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর ব্যক্তি-সত্তাকে বোঝানো হয়েছে। ইতোপূর্বে আল্লাহ্

ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ
سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٧١﴾

কাছে পাঠিয়েছিলেন ও তাঁর পক্ষ থেকে রূহ্‌। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান আন এবং বলো না, ‘তিন(১)!’ নিবৃত্ত হও,

---

তা‘আলা ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে মারইয়াম ‘আলাইহিস্‌ সালামকে ঈসা ‘আলাইহিস্‌ সালাম সম্পর্কে যে সুসংবাদ দান করেছিলেন সেখানে ‘কালেমা’ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ﴿اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ﴾ “যখন ফিরিশ্‌তারা বললো, হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন এক ‘কালেমা’র” ।[সূরা আলে-ইমরানঃ ৪৫] (দুই) কারো মতে এখানে ‘কালেমা’ অর্থ নিদর্শন। যেমন অন্য এক আয়াতে শব্দটি নিদর্শন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা: ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا﴾ [সূরা আত-তাহরীম: ১২] তাই আল্লাহ্‌ তা‘আলা কর্তৃক মার্‌ইয়ামের প্রতি ‘কালেমা’ পাঠাবার অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ তা‘আলা মার্‌ইয়াম ‘আলাইহাস্‌ সালামের গর্ভাধারকে কোন পুরুষের শুক্রকীটের সহায়তা ছাড়াই গর্ভধারণের হুকুম দিলেন। সে হিসেবে ঈসা আলাইহিস সালাম শুধু আল্লাহ্‌র কালেমা বা নির্দেশে চিরাচরিত প্রথার বিপরীতে পিতার মাধ্যম ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। (তিন) কাতাদা বলেন, কালেমা দ্বারা كُنْ বা ‘হও’ শব্দ বোঝানো হয়েছে। [তাবারী] ঈসা আলাইহিস সালামকে ‘কালেমাতুল্লাহ’ বলার কারণ হচ্ছে এই যে, ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের ব্যাপারটি জাগতিক কোন মাধ্যম বাদেই আল্লাহ্‌র কালেমা দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এখানে তাকে ‘আল্লাহ্‌র কালাম’ বলে বিশেষভাবে উল্লেখ করে সম্মানিত করাই উদ্দেশ্য। নতুবা সবকিছুই আল্লাহ্‌র কালেমার মাধ্যমেই হয়। তাঁর কালেমা ব্যতীত কিছুই হয় না। আল্লাহ্‌ ঈসা আলাইহিস সালামকে তাঁর নিদর্শন ও আশ্চর্যতম সৃষ্টি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি জিবরাইল আলাইহিস সালামকে মারইয়ামের নিকট পাঠালেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম তার জামার ফাঁকে ফু দিলেন। এ পবিত্র ফেরেশতার পবিত্র ফুঁ মারইয়ামের গর্ভে প্রবেশ করলে আল্লাহ্‌ তা‘আলা সে ফুঁকটিকে পবিত্র রুহ হিসেবে পরিণত করলেন। আর এ জন্যই তাঁকে সম্মানিত করে ‘রুহুল্লাহ’ বলা হয়ে থাকে। [তাফসীরে সা‘দী]

(১) কুরআন নাযিলের সমসাময়িক কালে খৃষ্টানরা যেসব উপদলে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে তাদের ধর্মবিশ্বাস তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক দল মনে করতো - মসীহ্‌ই আল্লাহ্‌। স্বয়ং আল্লাহ্‌ই মসীহ্‌রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। দ্বিতীয় দল বলতো - মসীহ্‌ পুত্র। তৃতীয় দলের বিশ্বাস ছিল - তিন সদস্যের সমন্বয়ে আল্লাহ্‌র একক পরিবার। এ দলটি আবার দু’টি উপদলে বিভক্ত ছিল। এক দলের মতে পিতা, পুত্র ও মারইয়াম এ তিনের সমন্বয়ে এক আল্লাহ্‌। অন্য একদলের মতে মারইয়াম ‘আলাইহিস্‌ সালাম-এর পরিবর্তে ‘রূহুল কুদুস’ বা পবিত্র আত্মা জিবরাঈল ‘আলাইহিস্‌ সালাম ছিলেন তিন আল্লাহ্‌র একজন।

মোটকথা, খৃষ্টানরা ঈসা ‘আলাইহিস্‌ সালাম-কে তিনের এক আল্লাহ্‌ মনে করতো।

এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আল্লাহ্ই তো এক ইলাহ্; তাঁর সন্তান হবে---তিনি এটা থেকে পবিত্র-মহান। আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই; আর কর্মবিধায়করূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট(১)।

চব্বিশতম রুকূ’

১৭২. মসীহ্ আল্লাহ্র বান্দা হওয়াকে কখনো হেয় মনে করেন না, এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশ্তাগণও করে না। আর কেউ

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا
الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ
عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿١٧٢﴾

তাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য কুরআনুল কারীমে প্রত্যেকটি উপদলকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সম্মিলিতভাবেও সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সামনে স্পষ্ট ও জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, সত্য একটিই। আর তা হলো ঈসা মসীহ্ ‘আলাইহিস্ সালাম তাঁর মাতা মারইয়াম ‘আলাইহিস্ সালাম-এর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী একজন মানুষ ও আল্লাহ্ তা‘আলার সত্য রাসূল। এর অতিরিক্ত তাঁর সম্পর্কে যা কিছু বলা বা ধারণা করা হয়, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বাতিল। তাঁর প্রতি ইয়াহূদীদের মত অবজ্ঞা বা ঈর্ষা পোষণ করা অথবা খৃষ্টানদের মত অতিভক্তি প্রদর্শন করা সমভাবে নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কুরআনুল কারীমের অসংখ্য আয়াতে একদিকে ইয়াহূদী-খৃষ্টানদের পথভ্রষ্টতা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, অপরদিকে আল্লাহ্ তা‘আলার দরবারে ঈসা ‘আলাইহিস্ সালাম-এর উচ্চ মর্যাদা ও বিশেষ সম্মানের অধিকারী হওয়ার কথাও জোরালোভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। ফলে অবজ্ঞা ও অতিভক্তি দু’টি পরস্পর বিরোধী ভ্রান্ত মতবাদের মধ্যবর্তী সত্য ও ন্যায়ের সঠিক পথ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

(১) অর্থাৎ আকাশ ও যমীনের উপর হতে নীচে পর্যন্ত যাকিছু আছে সবই আল্লাহ্ তা‘আলার সৃষ্টি ও তাঁর বান্দা। অতএব, তাঁর কোন অংশীদার বা পুত্র-পরিজন হতে পারে না। আল্লাহ্ তা‘আলা একাই সর্বকার্য সম্পাদনকারী এবং সকলের কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি একাই যথেষ্ট; অন্য কারো সাহায্য-সহযোগীতার প্রয়োজন নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার বা পুত্র-পরিজন থাকতে পারে না। সারকথা, কোন সৃষ্ট ব্যক্তিরই স্রষ্টার অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা নেই। আল্লাহ্ তা‘আলার পবিত্র সত্তার জন্য এর অবকাশও নেই, প্রয়োজনও নেই। অতএব, একমাত্র বিবেকবর্জিত, ঈমান হতে বঞ্চিত ব্যক্তি ছাড়া আল্লাহ্ তা‘আলার সৃষ্ট কোন জীবকে তাঁর অংশীদার বা পুত্র বলা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

তাঁর ইবাদাতকে হেয় জ্ঞান করলে এবং অহংকার করলে তিনি অচিরেই তাদের সবাইকে তাঁর কাছে একত্র করবেন⁽¹⁾।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ
أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ
اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا ۙ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا
وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾

১৭৩. অতঃপর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তিনি তাদেরকে পূর্ণ করে দিবেন তাদের পুরস্কার এবং নিজ অনুগ্রহে আরো বেশী দেবেন। আর যারা (আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা) হেয় জ্ঞান করেছে এবং অহংকার করেছে, তাদেরকে তিনি কষ্টদায়ক শাস্তি দেবেন। আর আল্লাহ্‌ ছাড়া তাদের জন্য তারা কোন অভিভাবক ও সহায় পাবে না।

---

(১) ঈসা ‘আলাইহিস্‌ সালাম স্বয়ং এবং আল্লাহ্‌ তা‘আলার নৈকট্য লাভকারী ফিরিশ্‌তাগণ কখনো আল্লাহ্‌র বান্দারূপে পরিচিত হতে লজ্জা বা অপমান বোধ করেন না। কারণ, আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও গোলামী করা, তাঁর ‘ইবাদাত-বন্দেগী করা, আদেশ-নিষেধ পালন করা অতি মর্যাদা, গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয়। ঈসা মসীহ্‌ ‘আলাইহিস্‌ সালাম ও জিবরাঈল ‘আলাইহিস্‌ সালাম প্রমূখ বিশিষ্ট ফিরিশ্‌তাগণ এ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত রয়েছেন। তাই এতে তাঁদের কোন লজ্জা নেই। আসলে আল্লাহ্‌ তা‘আলা ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বা গোলামী করাই লজ্জা বা অমর্যাদার কাজ। যেমন, নাসারারা ঈসা মসীহ্‌ ‘আলাইহিস্‌ সালাম-কে আল্লাহ্‌র পুত্র ও অন্যতম উপাস্য সাব্যস্ত করেছে এবং মুশরিকরা ফিরিশ্‌তাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা ও দেবী সাব্যস্ত করে তাদের মূর্তি তৈরী করে পূজা-আর্চনা শুরু করেছে। অতএব, তাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি ও অপমান অবধারিত রয়েছে। পক্ষান্তরে যারা সঠিকভাবে ঈমান আনবে এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ‘যে বক্তি এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর সত্য কোন মা‘বুদ নেই। তিনি এক এবং তার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল আর ঈসা ‘আলাইহিস্‌ সালাম আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং সে কালেমা যা তিনি মারইয়াম ‘আলাইহাস্‌ সালাম-এর মধ্যে পৌঁছিয়েছেন এবং তার পক্ষ থেকে রূহ বিশেষ। আর এও ঈমান আনে যে, জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য। তার আমল যা-ই হোক না কেন, আল্লাহ্‌ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। [বুখারীঃ ৩৪৩৫]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَٰنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾

১৭৪. হে লোকসকল! তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের কাছে প্রমাণ এসেছে(১) এবং আমরা তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি(২) নাযিল করেছি ।

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِهِۦ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِى رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾

১৭৫. সুতরাং যারা আল্লাহ্‌তে ঈমান এনেছে এবং তাঁকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করেছে তাদেরকে তিনি অবশ্যই তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করবেন এবং তাদেরকে সরল পথে তাঁর দিকে পরিচালিত করবেন ।

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ

১৭৬. লোকেরা আপনার কাছে ব্যবস্থা জানতে চায়(৩) । বলুন, ‘পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান

---

(১) ‘বুরহান’ শব্দের আভিধানিক অর্থ অকাট্য দলীল-প্রমাণ । এ আয়াতে এর দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তা ও মহান ব্যক্তিত্বকে বুঝানো হয়েছে । আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান ব্যক্তিত্বের জন্য ‘বুরহান’ শব্দ প্রয়োগ করার তাৎপর্য এই যে, তার বরকতময় সত্তা, অনুপম চরিত্র মাধুর্য, অপূর্ব মু‘জিযাসমূহ, তার প্রতি বিস্ময়কর কিতাব আল-কুরআন নাযিল হওয়া ইত্যাদি তার রেসালাতের অকাট্য দলীল ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ । যার পরে আর কোন সাক্ষ্য প্রমাণের আবশ্যক হয় না । অতএব, তার মহান ব্যক্তিত্বই তার সত্যতার অকাট্য প্রমাণ ।

(২) আলোচ্য আয়াতে نور (নূর) শব্দ দ্বারা কুরআন মাজীদকে বোঝানো হয়েছে । যেমন, সূরা আল-মায়েদার ১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ﴾ অর্থাৎ তোমাদের কাছে আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে এক উজ্জ্বল আলো তথা এক প্রকৃষ্ট কিতাব অর্থাৎ আল-কুরআন এসেছে । আবার নূর অর্থ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আল-কুরআনও হতে পারে । তখন এর অর্থ হবে, হেদায়াতের নূর । যে আলোর ছোয়া লাগলে মানুষের হিদায়াত নসীব হয় । তবে তার অর্থ এই নয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবীয় দৈহিকতা থেকে মুক্ত শুধু নূর ছিলেন, যেমনটি কোন কোন ভ্রষ্ট সম্প্রদায় বিশ্বাস করে থাকে ।

(৩) জাবের ইবন আবদুল্লাহ বলেন, আমি অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে আসলেন । তিনি অজু করে আমার উপর পানি ছিটিয়ে দিলে আমার হুঁশ আসে । অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মীরাস কারা পাবে? আমার তো ‘কালালাহ’ ছাড়া আর কোন ওয়ারিশ নেই । তখন ফারায়েযের আয়াত নাযিল হয় । [বুখারী: ১৯৪; মুসলিম: ১৬১৬]

امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ
فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن
كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ
شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন, কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক বোন থাকে(১) তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক। আর সে (মহিলা) যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। অতঃপর যদি দুই বোন থাকে তবে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ। আর যদি ভাই-বোন উভয়ে থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হবে -এ আশংকায় আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরিস্কারভাবে জানাচ্ছেন এবং আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সবিশেষ অবগত(২)।

---

(১) আল্লামা শানকীতী বলেন, এখানে এমন সব ভাই-বোনের মীরাসের কথা বলা হচ্ছে, যারা মৃতের সাথে বাবা-মা উভয়ের দিক থেকে অথবা শুধুমাত্র বাবার দিক থেকে শরীক। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার তার এক ভাষণে এ ব্যাখ্যাই করেছিলেন। কোন সাহাবা তার এই ব্যাখ্যার সাথে মতবিরোধ করেননি। ফলে এটি একটি ইজমা বা সর্বসম্মত মতে পরিণত হয়েছে। আয়াতে এক বোনের জন্য অর্ধেক। আর দুই বোনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ ঘোষণা করা হয়েছে। যদি দুই এর অধিক বোন থাকে তবে তাদের ব্যাপারে এখানে কিছু বলা হয় নি। অন্য আয়াতে সেটাও বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, বোনদের সর্বোচ্চ অংশ হচ্ছে, দুই তৃতীয়াংশ। তারা যত বেশীই হোক না কেন এ সীমা অতিক্রম করে যাবে না। বলা হয়েছে, 'অতঃপর যদি তারা দুই এর অধিক মহিলা হয়, তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশের মালিক হবে।' [সূরা আন-নিসা:১১]

(২) বারা' ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ সবশেষে নাযিলকৃত সূরা হল সূরা বারাআত (তাওবাহ)। আর সবশেষে নাযিলকৃত আয়াত হল এই আয়াত। [বুখারীঃ ৪৩৬৪, ৪৬০৫, ৪৬৫৬, মুসলিমঃ ১৬১৮]